৩৫ বর্ষ ■ ৩য় সংখ্যা ■ জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৫

সূচিপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
মূল্যবোধের কবিতা	গুরুসদয় দত্ত	১
আমাদের কথা		২
চলে গেলেন মণিদা	পূরবী ঘোষ	৩
ভর দিব্যদৃষ্টি কামদেবপুর	মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার	৪
অসংগঠিত মানুষের লড়াই	বোলান গঙ্গোপাধ্যায়	৬
জলাভূমি সমীক্ষার ইতিবৃত্ত	ধ্রুবা দাশগুপ্ত	১০
ঠাণ্ডা ঘরে থাকলে মোটা?	গৌতম মিস্ত্রী	১৩
বজ্রপাত	বিবেক সেন	১৬
সনাতনের তৃতীয় কাহিনী	জয়দেব গুপ্ত	২০
সংখ্যা একব্যাখ্যা অনেক	ভূপতি চক্রবর্তী	২৬
শ্রমিক সমবায়	অরুণ পাল	৩০

সম্পাদক
সমীরকুমার ঘোষ

রেজিস্টার্ড অফিস: বি ডি ৪৯৪, সল্টলেক, কলকাতা- ৬৪
কার্যালয়: খাদিমস বিদ্যাকুট আবাসন
বি ৪ ও ৫, এস- ৩, নারায়ণপুর
পোঃ (আর গোপালপুর) কলকাতা- ৭০০ ১৩৬
ফোন: ৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৯৪৩৩৮৮৮৮৬২/
৯৮৩১৪৬১৪৬৫
ওয়েবসাইট: www.utsamanush.com
ই-মেল: utsamanush1980@gmail.com

মূল্যবোধের কবিতা

চৌদ্দপণ

গুরুসদয় দত্ত

মোরা ছুট্‌ব
মোরা খেল্‌ব
ব'সে কুঁড়ে হয়ে থাক্‌ব না;
ছাতি ফাট্‌বে
মাথা ভাঙ্গ্‌বে
তবু খেলা ছেড়ে হঠ্‌ব না।।
মোরা নাচ্‌ব
মোরা গাইব
মিছে সরমেতে জড়্‌ব না;
গুরু ছাত্র
পুঁথি মাত্র
প'ড়ে অকালেতে মর্‌ব না।।
মোরা হাস্‌ব
ভয় নাশ্‌ব
বাধা বিপদেতে টল্‌ব না;
প্রাণ খল্‌ব
মান ভুল্‌ব
দীন দুখীদের ঠেল্‌ব না।।
গায়ে খাট্‌ব
বন কাট্‌ব
মাথা গুঁজে বসে ভাব্‌ব না;
মাটি খুঁড়্‌ব
চাষ জুড়্‌ব
কভু শ্রমে অবহেলা কর্‌ব না।।

শেষ অংশ ১২ পাতায়

আমাদের কথা

ম্যাগি তো ছাড়ব, সময় জোগাবে কে!

হেড অফিসের বড়বাবু একলা বসে ঝিমঝিমিয়ে হঠাৎ গোঁফ গেল গোঁফ গেল বলে চেঁচিয়ে অফিস মাথায় করেছিলেন। ম্যাগি, নুডল্‌স নিয়ে আমাদের অবস্থাও তেমন হল। খবরের কাগজে, টিভিতে লেখায়, বুকনিতে গেল ভরে। অনেক অত্যুৎসাহী রাজ্য ম্যাগি, নুডল্‌স নিষিদ্ধ করে দিল। আমাদের রাজ্য দূরদর্শী, ওসব ঝামেলায় যায়নি। না হোক দু দশক আগে এই উৎস মানুষেই আজিনামটো, চাইনিজ রেস্তোরাঁ সিনড্রোম, নুডল্‌স ইত্যাদির ক্ষতিকর দিক নিয়ে বিস্তারিত লেখা হয়েছে। সবাই জানত এটা খাওয়া খারাপ। ফাস্ট ফুড যে আমাদের সুপার ফাস্ট গতিতে বিপদের মুখে ঠেলে দেয়, তা নিয়ে অন্য পত্রপত্রিকাতেও লেখালিখি কম হয়নি। খাওয়া বন্ধ হয়নি। আসলে এখনকার 'অতিব্যস্ত' জীবনযাত্রায় রথ দেখা ও কলা বেচার মতো বাচ্চা-বুড়োকে খাওয়ানো এবং একই সঙ্গে সময় বাঁচানোর মতো জাদুরাস্তা ম্যাগির মতো কে দেখাতে পেরেছে! যাঁরা ম্যাগি, নুডল্‌স, টপ রেমন নিয়ে গেল গেল রব তুলেছেন, তাঁরা কি দৈনন্দিন জীবন থেকে খাবার বানানোর সময় বের করে দেবেন! দেবেন না, দিতে পারবেনও না। আগে সংসারে শ্বাশুড়ি, ননদ, জা, পিসি বা মাসিশাশুড়িরা থাকতেন খিদমত খাটার জন্য। এখন এই শ্রেণী লুপ্তপ্রায়। থাকলেও নিরাপদ দূরত্বে। তাই বাজার থিতিয়ে গেলে আবার সগৌরব ফিরে আসবে ম্যাগি-নুডলরা। খারাপ জেনেও সিগারেট, মদ খেতে পারি; দুধ, ময়দা, চিনি, ঠাণ্ডাপানীয় খেতে ও খাওয়াতে পারি; আর বাচ্চাদের সামান্য মনোসোডিয়াম গ্লুটামেট বা খানিকটা সীসা খাওয়াতে পারব না! কথাতেই আছে, ছাগলে কি না খায়, কাগজে কি না লেখে!

একটা সময় জ্ঞান, শিক্ষা ইত্যাদির জন্য পাশ্চাত্ত্য তাকিয়ে থাকত প্রাচ্যের এই ভূখণ্ডের দিকে। এখনও তাকিয়ে থাকে, তবে 'মুরগি'-ঋদ্ধ বাজারের দিকে। অন্যদিকে আমরা মুক্তি, মোক্ষ সবের জন্যেই তাকিয়ে আমেরিকার দিকে। ওদের চালচলন, রাস্তাঘাট, গাড়িবাড়ি, পোশাকআশাক, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি– এককথায় যাবতীয় কিছু অনুকরণ করে ধন্য হই। সম্প্রতি ও দেশে সমলিঙ্গ বিবাহ আইনি স্বীকৃতি পেয়েছে। আমাদের দেশেও চালু হল বলে। দেশের সর্বোচ্চ আদালত মায়ের পরিচয়ে মোহর দিয়েছে। হীনম্মন্যতা নয়, গর্বের সঙ্গে নিজের এলজিবিটি পরিচয়ও দেওয়া যাবে। এই রকম নানা সমাজ-বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে দুদ্দাড় গতিতে দেশ এগিয়ে চলেছে। হিন্দি-চিনি ভাই ভাইয়ের মতো হিন্দি-আমেরিকাও ভাই ভাই হয়ে উঠছে ভেবে গর্বে যখন আটখানা, তখনই খবর, দক্ষিণভারতে কুম্ভস্নান করতে গিয়ে বহু লোক পদপিষ্ট হয়ে মারা গিয়েছেন। এই মৃত্যুর খবরে কেউ ভারাক্রান্ত হতে পারেন। ওই মৃতের পরিবার একটুও ব্যথিত হয় না। কারণ, এইভাবে মৃত্যু মানে সরাসরি স্বর্গের টিকিট পেয়ে যাওয়া। অতি পুণ্যবানরাই কুম্ভমেলা বা রথযাত্রার মতো পবিত্র উৎসবে মৃত্যুবরণ করেন।

শ্রাবণ মাস। কলকাতার বিভিন্ন সড়ক আলো করে বাবার ভক্তের দল ছুটতে শুরু করেছে তারকেশ্বরের উদ্দেশে। যত দিন যাচ্ছে ভক্তসংখ্যা বাড়ছে। লক্ষণীয় হারে বাড়ছে মহিলাদের উপস্থিতি। ভক্তি-প্রদর্শনে ওরাই বা পিছিয়ে থাকে কেন! তারকনাথের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে উঠে আসছেন লোকনাথ। ভক্তেরা তাঁর জটাজুট মাথা হাতের কাছে না পেয়ে তাঁর থানে গিয়ে এন্তার জল ঢেলে ভাসিয়ে আসছে। বিভিন্ন পুজোর বিসর্জনে এখন কর্ণবিদারী বক্স-সহ ডিজে পরিচালিত নাচাগানার বহুল চল। বিসর্জনে নাচাকোঁদা একচেটিয়া ছিল ছেলেদের। এখন মেয়ে-বৌরাও 'হম কিসিসে কম নহি' ভঙ্গিতে উদ্দামতায় কম যাচ্ছে না। এরপর মেয়েরা সবেতে পিছিয়ে বলার আগে দুবার ভাবা উচিত।

এনসিইআরটি তার স্কুলপাঠ্য বইতে একটি বোমা ফাটিয়েছে। অষ্টম শ্রেণীর সমাজবিদ্যার বইতে বেসরকারি হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে না গিয়ে সরকারি হাসপাতালে যেতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। যুক্তি দেখানো হয়েছে, ওই সব জায়গায় বেঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করায় উৎসাহ দেওয়া হয়। উদাহরণও দেওয়া হয়েছে– যেখানে কেবল ট্যাবলেট দিয়েই সারিয়ে তোলা যায়, সেখানে অপ্রয়োজনে ওষুধ, ইঞ্জিকশন বা স্যালাইন দেওয়া হয়। এটুকু বর্ণনা দিয়েই বইটি ক্ষান্ত হয়নি। কমিক স্ট্রিপ এঁকে পাশাপাশি সরকারি ও বেসরকারি চিকিৎসার খরচের বহরও দেখানো হয়েছে। আমন ভাইরাল জ্বর নিয়ে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়। সে জানাচ্ছে, 'হাসপাতালে পাঁচতারা হোটেলের মতো পরিবেশ। চারিদিক ঝকঝকে, তকতকে। হাল্কা সুরে গান বাজছে। ডাক্তার অনেকগুলো পরীক্ষা করাতে বলল। সবাই খুব বন্ধুত্বপূর্ণ। যে মহিলা রক্ত নিল, সে এমন মজার চুটকি শোনাতে লাগল, কোনো যন্ত্রণাই টের পেলাম না।' একই সমস্যা নিয়ে রঞ্জন গেল সরকারি হাসপাতালে। তাকে আউটডোরে লম্বা লাইনে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াতে হল। ক্লান্তিকর অবস্থা। গুচ্ছের ওষুধপত্রে আমনের খরচ হল ৩৫০০ টাকা, আর রঞ্জনের মাত্র ১৫০। বেসরকারি হাসপাতালের চেহারা এইভাবে সামনে আনায় প্রবল চটেছে আইএমএ। স্বাস্থ্য ও মানবসম্পদ বিভাগে প্রতিবাদ জানিয়েছে। চ্যাপ্টারটাকে বই থেকে বাদ দেওয়ার দাবি জানিয়েছে। এনসিইআরটি- র অধিকর্তা বি কে ত্রিপাঠী অভিযোগ খতিয়ে দেখছেন, বলে জানিয়েছেন।

উমা

চলে গেলেন মণিদা

পূরবী ঘোষ

'উৎস মানুষ'-এর একজন শুভানুধ্যায়ী, ভাল বন্ধু মণিদা আর নেই। নেই মানে শুধুই নেই। হাজারবার ফোন করলে বা খুঁজলেও মণিদাকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। আপাতগম্ভীর মুখে, লম্বা লম্বা পা ফেলে আমাদের আড্ডায় ঢুকে পড়ে অতি সহজেই আলোচনায় অংশ নিতে পারতেন যে মানুষটি, তিনি আর আমাদের মধ্যে নেই, একথা বিশ্বাস করা যাচ্ছে না। 'উৎস মানুষ'-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক প্রয়াত অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ছিল মণিদার হৃদ্যতা। সেই সূত্রেই মাঝে মাঝে আসতেন আমাদের আড্ডায় নিবারণদার ঘরে। আমাদের সঙ্গে তখন থেকে গড়ে উঠেছিল বন্ধুত্ব।

আমাকে মণিদা আদর করে 'দিভাই' বলে ডাকতেন। মনে পড়ছে সেই দিনগুলোর কথা। আমরা বেশ কয়েকজন বন্ধু শীতের ছুটিতে লঞ্চে সুন্দরবন বেড়াতে গিয়েছিলাম। যে দু-তিনটে দিন আমরা একসঙ্গে লঞ্চে অনেকে মিলে ছিলাম, সেই সময় অন্য এক মণিদাকে পেয়েছিলাম। অধ্যাপকীয় গাম্ভীর্য দূরে সরিয়ে রেখে ওই দিনগুলো মণিদা ভরিয়ে রেখেছিলেন হাসি, গল্প, আড্ডা দিয়ে। বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন মণিদা, অধ্যাপকও ছিলেন বিজ্ঞানের। কিন্তু বইয়ের মধ্যে তিনি বিজ্ঞানকে কখনই বন্দী রাখতে চান নি। সাধারণ ঘরোয়া মানুষ, যারা না জেনেই বিজ্ঞানকে নানাভাবে কাজে লাগায়, বিজ্ঞানের দ্বারা উপকৃত হয়, অথচ বিশ্বাস করে অলৌকিকে, সাধুবাবা গুরুঠাকুরদের অতিলৌকিক ক্ষমতাকে, সেইসব মানুষদের কাছে মণিদা বিজ্ঞানের স্বরূপ তুলে ধরার কাজ করে গেলেন সারাজীবন। যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে সমস্ত ঘটনাকে বিশ্লেষণ করার আহ্বান রেখে গেলেন তাঁর লেখায়, তাঁর ভাষণে। উৎস মানুষ পত্রিকায় একসময় মণিদা প্রায় নিয়মিত লেখক ছিলেন। তাঁর লেখার মূল বিষয় ছিল কুসংস্কার বিরোধিতা ও যুক্তিমনস্কতার প্রতিষ্ঠা।

কর্মসূত্রে আমি বেশ কিছুদিন রানাঘাটে একটা দুঃস্থ বাচ্চাদের হোমে ছিলাম। বন্ধুদের থেকে ঠিকানা জোগাড় করে হঠাৎ একদিন মণিদা 'নীহারিকা' নামের সেই হোমে গিয়ে হাজির হলেন। আমি তো খুবই অবাক হলাম। মণিদা বললেন, 'দিভাই, তুমি এখানে আছ, আর আমি আসব না?' তারপর 'নীহারিকা'র কর্ণধার কুণাল লামার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুবই খুশি হয়েছিলেন। মাঝে মাঝেই তিনি নীহারিকায় হাজিরা দিতেন। হোমের বাচ্চাদের জন্য মণিদা ব্যারোমিটার, নানা আকৃতির চুম্বক, ছোট্ট কম্পাস ইত্যাদি নানা ধরনের বিজ্ঞান শেখার ছোট ছোট উপকরণ উপহার হিসেবে নিয়ে যেতেন। আর আমাকে বলতেন, 'ছোটর থেকেই ওদের দিক নির্ণয় করতে শেখাও, তাপমাত্রা মাপতে শেখাও।' ছোটদের মধ্যে বিজ্ঞান চেতনা গড়ে তোলার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে গেছেন।

তবে বিজ্ঞানী মণিদা যে সমাজ সংসার বাদ দিয়ে শুধু বিজ্ঞানচর্চা করে গেছেন তা নয়, যে কোনো সামাজিক আন্দোলনেও মণিদাকে দেখা যেত। সাম্প্রতিককালে সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে কৃষকদের জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা আন্দোলনেরও একজন সৈনিক ছিলেন মণিদা। আর্সেনিক দূষণের বিরুদ্ধেও তাঁর লেখালেখি আছে অনেক। মণিদার কাজের পরিধি এতটাই বড় আর বহুমুখী যে এই ছোট্ট পরিসরে তাঁকে ধরা যাবে না। অসমাপ্ত রয়ে গেল তাঁর অনেক কাজ। তাঁর অগণিত ছাত্রসমাজ, তাঁর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার মধ্যে দিয়ে তাদের শ্রদ্ধেয় 'স্যার'-কে তারা বাঁচিয়ে রাখবে। আর আমাদের মতো সাধারণ মাপের মানুষেরা আমাদের স্মৃতির মধ্যে বাঁচিয়ে রাখব মণিদাকে। সারা জীবন বিজ্ঞানকে, বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করার পর গত ৭ জুন, ২০১৫ রবিবার থামলেন বিজ্ঞানী ডঃ মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার।

উমা

আহরণ

ভর দিব্যদৃষ্টি ও কামদেবপুর রহস্য

মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

'ভর হওয়া' নামের ঘটনার সঙ্গে কমবেশি পরিচয় আমাদের সকলেরই রয়েছে। কোন কোন ব্যক্তির বিশেষ দিনে বা বিশেষ অবস্থায় 'ভর হয়'; তখন কোন দেবদেবী বা কিছু অতিপ্রাকৃত শক্তির দ্বারা সেই ব্যক্তির বাস্তব সত্তা সাময়িকভাবে আচ্ছন্ন বা নিষ্ক্রিয় হয় এবং সেই অলৌকিক শক্তি ওই ভরাবিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে দিয়ে নানাভাবে নিজেকে প্রকাশ করে, এরকমই প্রচলিত বিশ্বাস। 'ভর-হওয়া' অবস্থায় ব্যক্তির হাবভাব, বাচনভঙ্গী, ব্যক্তিত্ব অনেকটাই পাল্টে যায় এবং সে এমন সব কথাবার্তা বলতে থাকে যা সাধারণ মানুষকে বিস্মিত, অভিভূত করে। গভীর বিশ্বাস ও ভরসা নিয়ে বহু মানুষ তাদের কাছে যান এবং ভরাবিষ্ট অবস্থায় তারা যা বলে তার ওপর নির্ভেজাল আস্থা রেখে অনেকে রোগশোকের চিকিৎসা করান, ছেলে কিংবা মেয়ের বিয়ে দেন, ব্যবসা-বাণিজ্যে টাকা লগ্নী করেন। ভর-হওয়া ব্যক্তির প্রতিনিধি বা চ্যালা-চামুণ্ডারা ভক্ত আর বিশ্বাসী দর্শনার্থীদের থেকে ঠাকুর বা দৈবশক্তির নামে অর্থ গ্রহণ করে, কোথাও বা দানসামগ্রী নেওয়া হয় টাকার পরিবর্তে। একে কেন্দ্র করে মন্দির, দেবস্থান বা সম্প্রদায় গড়ে ওঠে।

বিরাট কৌতূহল আর বিস্ময় জড়িয়ে থাকে এসব ঘটনার সঙ্গে। কেউ কেউ এগুলিকে ভণ্ডামি বা নিছক মনোবিকার বলে অগ্রাহ্য করে থাকেন। কিন্তু অন্যদিকে অসংখ্য সহজ সাধারণ মানুষ এসবে গভীরভাবে বিশ্বাস করেন এবং ছোট-বড় নানা সঙ্কট-সমস্যায় এই 'অলৌকিক' পদ্ধতির ওপর নির্ভর করেন। কাজেই এ জাতীয় ঘটনার বাস্তব তথ্যভিত্তিক অনুসন্ধান খুবই প্রয়োজনীয় কাজ। বিজ্ঞানে অলৌকিক বা দৈবশক্তির স্থান নেই; সুতরাং ভরাবিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে একেবারে অজানা, কখনো না-শোনা কোনো ব্যাপারে কিছু বলে দেওয়া সম্ভব নয়, ভবিষ্যৎ বলা আরো অসম্ভব। তবু অনেক কিছুই আশ্চর্যজনক কথা বলা হয়, মানুষ বিমূঢ় হয়। এরকম চমকপ্রদ কাণ্ডকারখানার কৌশল আবার প্রকাশও হয়ে পড়ে কখনো কখনো, মানুষ রহস্যের অন্তরালে লুকনো সত্যটা জেনে ফেলে। তবু, একথা মানতেই হবে, 'ভর'-এর মধ্যেকার বেশ কিছু ব্যাপার এখনো দুর্বোধ্য বা অস্পষ্ট। বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ ছাড়া এমন মন্তব্য করা যায় না যে সবই চালাকি আর ধাপ্পা। শত শত বছর ধরে পৃথিবীর সব দেশেই অনেক মানুষের ভর হয়েছে এবং এদের মধ্যে অনেকেই বিখ্যাত, শ্রদ্ধেয়। ফ্রান্সের জোয়ান অভ আর্ক থেকে শুরু করে আমাদের রামকৃষ্ণ পরমহংস পর্যন্ত অনেকের নামই এ প্রসঙ্গে করা যায়। কাজেই রহস্য রয়েছে, জানবার বোঝবার রয়েছে অনেক। আধুনিক শারীরবিদ্যা ও মনোবিজ্ঞান বিজ্ঞানসম্মতভাবে 'ভর হওয়া'র রহস্যের অনেকটা ব্যাখ্যা করতে পেরেছে; সেইসব আবিষ্কার একই রকম চমকপ্রদ। এখন মোটামুটি আস্থার সঙ্গেই বলা চলে যে, ভর-হওয়ার মধ্যে অতিপ্রাকৃত শক্তি বা দৈবশক্তির ভূমিকা বলে কিছু নেই, আছে মনস্তাত্ত্বিক কারণ। কিন্তু এরকম অস্বাভাবিক আচরণকে কেন্দ্র করে যেসব ধর্মস্থান বা অর্থোপার্জন কেন্দ্র গড়ে উঠেছে চতুর্দিকে তাদের প্রভাব যেমন ব্যাপক তেমনি হল তাদের রহস্যময় কাজ কারবার। কেবল অশিক্ষিত গ্রামাঞ্চলেই এদের দাপট রয়েছে এমন ভাবলে ভুল হবে; সাঁইবাবা রাজনীশ এদেরকে বাদই দিচ্ছি, আমাদের ঘরের কাছে লেক কালীবাড়ি, বালক ব্রহ্মচারীর আশ্রম, কামদেবপুর ইত্যাদির আকর্ষণে শিক্ষিতরাও তো ছুটে চলেছেন অন্ধভাবে। এর মধ্যে উত্তর ২৪ পরগনার কামদেবপুরে সরেজমিন অনুসন্ধান চালিয়েছিলাম আমরা সত্য উদ্ঘাটনের প্রত্যাশায়।

কামদেবপুরে পীরের ভর

বারাসাত থেকে মাইলপাঁচেক উত্তরে কামদেবপুর ঠাকুরবাড়ি। ৩৪নং জাতীয় সড়কের (NH - 34) উপর একটি সাইনবোর্ড ঠাকুরবাড়ি যাওয়ার নিশানা দিচ্ছে।

এখানকার শিরোমণি বা ভরবিন্দু হলেন সূর্যকুমার মাইতি (৬৭) নামে জনৈক প্রবীণ উদ্যমী বুদ্ধিমান ব্যক্তি যিনি এককালে অতি সাধারণ অবস্থায় ছিলেন এবং কলকাতায় দুধ বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তাঁর পিতা প্রিয়নাথ মাইতি কবিরাজ ছিলেন। দশ পুত্র কন্যার মধ্যে সূর্য ষষ্ঠ পুত্র। সূর্য বাবার কাছে ওষুধ তৈরির কাজ শিখেছিলেন যা পরবর্তীকালে তাঁকে যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ উপার্জনে সাহায্য করে। সূর্য কুমারের চার কন্যা ও দুই পুত্র। লেখাপড়া কারোরই বিশেষ হয় নি। ছেলেরা বাবার কারবারেই কাজ করে। মাদুলি ও ওষুধ বিক্রি করাই এদের বড় কাজ। অনুন্নত কামদেবপুরে তাদের বড় দোতলা পাকা বাড়ি, পিছনে নাটমন্দির, তারও পিছনে ছোট মন্দিরে গোরাচাঁদ পীরের সমাধি। সমাধির উপরে বসলে শনি মঙ্গলবার সূর্যকুমারের ('ফকির বাবা' নামে বিখ্যাত) ভর হয়। শোনা যায় সাতশো বছর আগেকার জনৈক মুসলমান পীর হজরত সৈয়দ আব্বাস আলী রজাই-এর পবিত্র আত্মার ভর হয়। কবরের ঘরে বাবা বসে থাকেন। দরজা বন্ধ। ১ টাকা ৩৩ পয়সা দিয়ে নাম লিখিয়ে কবরের ঘরের সামনে লাগোয়া এক ঘরে 'বাবা'র প্রতিনিধির কাছে গেলে সে নাম ও বয়স বলে, তাই শুনে ভরাবিষ্ট (!) সূর্যকুমার ('বাবা') আগন্তুক মক্কেলের আগমনের উদ্দেশ্য ও মুস্কিল-আসানের পথনির্দেশ বলে দেন বন্ধ ঘরের ভেতর থেকে। বেশিরভাগ লোকই রোগমুক্তির (নিজের বা সন্তানের) আশায় আসে, কেউ বা অন্যরকম দুর্ভাগ্য এড়াতে বা সৌভাগ্য বাড়ানোর হদিশ নিতে আসে। সমবেত চিকিৎসা প্রত্যাশীদের সঙ্গে সতর্কতার সঙ্গে কথা বলেছি আমরা। তা থেকে অনুমান করা যায় (এবং অঞ্চলের যুবকদের ধারণার সঙ্গে যা মিলে যায়) যে ফকির বাবার অনুচরেরা কলকাতায় হাসপাতালগুলিতে ঘোরাফেরা করে রোগীদের কথা সংগ্রহ করে এবং সেখান থেকে ফকির বাবার মক্কেল সংগ্রহ করে। দুরারোগ্য রোগ নিয়ে কিছু রোগী কামদেবপুরে এলে বাবা কখনো তাদের আগমনের কারণ, এমনকি রোগের বৈজ্ঞানিক নাম বলে দিয়ে সমাগত ব্যক্তিদের তাক্ লাগিয়ে দেন। ওষুধ তাবিজ কবচ মাদুলি বেচে এদের প্রচুর অর্থ উপায় হয়। তাছাড়া সূর্যকুমার কিছু টোট্‌কা কবিরাজি চিকিৎসা জানেন, অনেক সময়ই বনৌষধির গুণে কিছু রোগ ভালো হয়। এরকম কারো অসুখের ব্যাপার যদি ভালো মিলে যায়, সূর্যকুমারের খ্যাতি ছড়ায়; যাদের মেলে না তাদের কথা ছড়ায় কম, কারণ তারা আর আসে না। অনেকে আবার মনে করেন তাঁরা নিজেরাই কোন অন্যায় বা অবৈধ কাজ করায় মেলে নি। ঠাকুরকে দোষ দেওয়া থেকে অনেকেই বিরত থাকেন। মন্দির প্রাঙ্গণে সাইনবোর্ডে লেখা আছে:

'মাসিক ও অশৌচ অবস্থায় আসবেন না। এলে ভর বন্ধ হয়ে যাবে। চুরি ও হারানোর জন্য আসবেন না। বাবার আদেশ জানার পর রবি ও শুক্রবার সকালে এসে ওষুধ নিয়ে যাবেন।'

প্রতি শনি ও মঙ্গলবার দূর দূরান্তের বহু লোক সকাল থেকে এসে এখানে 'বাবার আদেশ' শুনে ওষুধ নিয়ে যায়। ('বাবা'র ছেলে ও সাকরেদরা জানালেন, শুধু ভারত নয় আমেরিকা, হংকং থেকেও লোক এসে ওষুধ নিয়ে যায়।) এদের ৩৯ বিঘে জমি ও গোটা তিনেক মোটর গাড়ি আছে।

ঠাকুরবাড়ির বাইরে বৃহত্তর অঞ্চল থেকে আরো কিছু জানা গেল। চিত্রাভিনেত্রী সুচিত্রা সেনের লিউকোমিয়া ভালো করে দিয়েছেন বলে যে গল্প কোনো কোনো মহলে চালু আছে তার কোনো ভিত্তি নেই। অর্বাচীন পুত্রদের জন্য সূর্যকুমার জাতীয় সড়কের উপর একটি কোল্ড স্টোরেজ বানিয়েছেন। বিচক্ষণ কর্মবীর সেখানে 'Site for Cancer Hospital' সাইনবোর্ড ঝুলিয়েছিলেন। কাজ এগোয় নি। তার পাওয়ারলুমের কারবারটিও ফলপ্রসূ হয় নি। কামদেবপুরের ঠাকুরবাড়ির মহিমা ও সূর্যকুমারের অলৌকিক ক্ষমতার গুণকীর্তন করে দুটি বই আছে: একটি ইংরাজিতে (Gorachand Pir: Biswanath Bandyopadhyay, M.A. Gold Medalist, 1981) আর একটি বাংলায় (ঠাকুরবাড়ির ইতিহাস: সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১৯৭৫)। প্রায় তিন দশক আগে ভর হওয়াকে কেন্দ্র করে যে জনসমাগম শুরু হয়েছিল তা তুঙ্গে ওঠে সত্তরের দশকের প্রথম দিকে। ভক্ত ও যাত্রী সমাগম এখন আগের চেয়ে নাকি কমে গেছে।

কামদেবপুরের এধার-ওধার কিছু আঞ্চলিক মানুষের সঙ্গে আলাপে অনেক তথ্য প্রকাশ হয়। উদ্যমী ও ভাগ্যান্বেষী সূর্যকুমার যৌবনে ঘাড়ে দুধের বাঁক নিয়ে ব্যবসা করতে করতে নতুন কারবারের কথা ভাবতেন। একদিন রটনা হল মাটি ফুঁড়ে শিব উঠবে সূর্যকুমার এমন স্বপ্নাদেশ পেয়েছেন। বিস্ফারিত নেত্র সকলের সামনে সত্যি একদিন শিব মাটি ফুঁড়ে উঠতে লাগল। শিবের মাথায় যত জল ঢালা হতে থাকল তত শিব উপরে উঠতে থাকল। লোকের বিস্ময়, কৌতূহল ও ভয়ের সামনে হঠাৎ ঐ গ্রামের কার্তিক ঠাকুর সকলকে স্তম্ভিত করে দিয়ে একটানে শিব তুলে ফেললেন।

মাটির ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ল ভেজা ছোলার বস্তা। গ্রামে মজা আর হাসির ঢেউ বয়ে গেল। ঘোমটা পরা বউরাও মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়ল। আবার দুধের কারবার, কষ্টের সংসারে ফের হাল টেনে চলা।

আবার স্বপ্নাদেশ। এবার নাকি আদেশ দিয়েছেন ঐ গ্রামেরই অতি পুরাতন ভাঙা এক কবরের তলার জনৈক মুসলিম পীর। (মুসলমান কিছু সাধু যাঁরা এককালে বাংলাদেশে জনসাধারণের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন তাঁরা পীর নামে সব সম্প্রদায়ের লোক কর্তৃকই পূজিত।) সেই পীর সাহেবকে গোরাচাঁদের মত দেখে লোকে তাকে গোরাচাঁদ পীর বলত। অথচ পীর সাহেব শ্রীচৈতন্যের প্রায় দুশো বছর আগেকার লোক। যাই হোক তাঁর স্বপ্নাদেশ অনুযায়ী সূর্যকুমার পীর সাহেবের ভাঙা কবর নতুন করে বানিয়ে দেন এবং আশীর্বাদ পান যে ভরে বসলে পীরের দৈবশক্তি সূর্যকুমারে আসবে। এরপরই তিনি 'ফকির বাবা' নামে প্রসিদ্ধ হন এবং 'মানবকল্যাণে আত্মোৎসর্গ' করে প্রচুর ধনবান হন।

নাটমন্দিরে আর একটি সাইনবোর্ড আছে : 'পীর বাবার বাৎসরিক উৎসব ১০ই ফাল্গুন হইতে ৭ দিন। ১লা বৈশাখে সকলের জন্য সমাধি খোলা হয়, কবরে জল ঢালার জন্য।'

ঔষধের ব্যবসায় ফকীর বাবা তাঁর তীক্ষ্ণ গ্রাম্য বৈষয়িক বুদ্ধি প্রয়োগ করে সকলকে এক লক্ষ্যে আনার জন্য প্রায় সব কিছু করেছেন। কবরে জল ঢালার ব্যবস্থা করে শিব ভক্তদের সুখী করেছেন, পীরকে উপাস্য বানিয়ে নিম্নবর্ণের হিন্দু মুসলমান সবাইকে মক্কেল করেছেন আর পীরকে গোরাচাঁদ ও মন্দিরকে ঠাকুর বাড়ী আখ্যাত করে বৈষ্ণব হিন্দু সবাইকেই ব্যবসায়ের এক মহাসঙ্গমে সফল ভাবে মিলিয়েছেন। এ সাফল্যের পরিচয় মেলে তার বিশাল পাকাবাড়ী আর ছেলেদের নাদুসনুদুস চেহারার মধ্যে।

পীরের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়েই বোধহয় পাঁচুগোপাল ঠাকুর ভর করতে আরম্ভ করলেন অদূরের নিতাইচন্দ্র কোলের বাড়ীতে। এখানে শোনা গেল নিয়মিত দৈবশক্তির ভর হয় এবং অন্ধকারে প্রসাদ খাওয়া, শব্দ করা, জিনিসপত্র নাড়িয়েই পাঁচুঠাকুর তাঁর উপস্থিতি প্রকাশ করেন। অনেক ভক্ত ও যাত্রী সমাগম হয়। প্রণামী পড়ে অনেক। বছর ১২/১৩ আগের হতদরিদ্র সংসারের অবস্থা পাঁচুঠাকুরের ভরে এখন অনেক ভালো হয়েছে।

উৎস মানুষ, জানুয়ারি ১৯৮৪

অসংগঠিত মানুষের বেঁচে থাকার লড়াই

বোলান গঙ্গোপাধ্যায়

তৃতীয় অংশ

কলিঙ্গনগর

গোপালপুর প্রকল্প বিষয়ে মিডিয়ার তেমন কিছু প্রচার না হলেও কলিঙ্গনগরের ঘটনা মিডিয়ায় যথেষ্ট সাড়া ফেলেছিল। কারণ জমি অধিগ্রহণ করতে গিয়ে, বহুজাতিকের পক্ষ অবলম্বন করে রাষ্ট্র তথা পুলিশবাহিনী এক অভূতপূর্ব নিষ্ঠুর ঘটনা সেখানে ঘটিয়েছিল। ২০০৬-এর ২ জানুয়ারি সেখানে গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলতে চেয়ে, রাস্তায় ল্যান্ডমাইন বিছিয়ে রেখেছিল পুলিশ, নিরস্ত্র সাতজন গ্রামবাসী সেই ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণে মারা গিয়েছিল। এর আগে, ভারতের অন্য কোথাও এই ধরনের নিষ্ঠুরতা এবং আগ্রাসনের এমন নগ্ন হিংস্র রূপ দেখা যায় নি।

কিন্তু এই ঘটনার আগে আছে এক দীর্ঘ প্রতিরোধের কাহিনী। কলিঙ্গনগরে আমি গিয়েছিলাম ২০১০-এর ফেব্রুয়ারির এক বিকেলে। কটক থেকে বাসে। সেখানে 'বিস্থাপন বিরোধী মঞ্চ-এর চক্রধর হাইব্রু এবং রবীন্দ্র জারিকা, এই দুজনের বাড়িতে ছিলাম। এঁরা দুজনেই মুন্ডা। এবং চাষী। যুবক রবীন্দ্র ও তাঁর স্ত্রী দুজনেই কটকের

কলেজ থেকে উচ্চশিক্ষা পেয়েছেন। কিন্তু সকাল হতেই তাঁরা বাড়ির গরুদের পরিচর্যা দিয়ে দিন শুরু করেন। মাঠে নিজ হাতে চাষ করেন। স্বামী, স্ত্রী ছাড়াও বাড়ির অন্য মেয়ে-পুরুষ সকলেই অসম্ভব পরিশ্রমী। পরিবারটির কেউ স্কুলে পড়ান, কেউ বা সরকারি কোনও কাজ করেন। প্রত্যেকেরই উচ্চশিক্ষার ডিগ্রি আছে। কিন্তু প্রত্যেকে জমিতেও কাজ করেন। জমির সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা আছেন। বাড়িতে একাধিক মোটরসাইকেল আছে। বিজলিও আছে। সম্পন্ন গৃহস্থ। আমি রবীন্দ্রর কাছে জানতে চেয়েছিলাম, সে শহরে লেখাপড়া সংক্রান্ত কাজ পেলে যেতে চায় কি না! সে বলেছিল, গ্রাম ছেড়ে বাইরে গিয়ে স্থিতির কথা কল্পনাও করতে পারে না। তার গরু, মোষ, তার গাছ, ক্ষেতের দেখভাল, এই জীবনই সে চায়। তার পিতৃ-পিতামহের এই বাড়ি ছেড়ে সে স্বর্গেও যেতে চায় না। লেখাপড়া শিখেছে পৃথিবীটাকে জানার জন্য। তার জন্য সে শিকড় ওপড়াবে কেন! রবীন্দ্রই আমাকে প্রশ্ন করে।

যাই হোক, এবার আসি কলিঙ্গনগরের প্রতিরোধের ইতিহাসে। জমি চলে গেলে, মানুষের জীবন-জীবিকার যে ঠিক কী অবস্থা হয়, সেটা এই অঞ্চলের মানুষকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল 'নীলাচল ইস্পাত নিগম লিমিটেড'। এটি একটি সরকারি সংস্থা। একরপ্রতি ৫৩ হাজার টাকা দাম স্থির করে জমি অধিগ্রহণ শুরু হয়। এবং প্রত্যেক পরিবারের একজনকে চাকরির প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, পুরো টাকা প্রায় কোনো পরিবারই পায় নি। ৬৬৪টি পরিবার স্থানচ্যুত হয়। ১০০ লোককে অস্থায়ী ঠিকেদারের কাছে অস্থায়ী কাজ দেওয়া হয়। বিরাট পুলিশবাহিনী এসে, ঘোর বর্ষার সময় এঁদের বাড়ি ঘর ভেঙে তছ্নছ করে দেয়। ছেলেদের ধরে নিয়ে গিয়ে জেলে পুরে দেয়। মেয়েদের আর বাচ্চাদের বলে 'ভাগ'। এরা সকলে মুন্ডা। বাচ্চারা সব যে যেখানে পারে, চলে যায়। জেল থেকে ছাড়া পাবার পর পুরুষরা সব পাথর ভাঙার কাজ করে। কেউ কেউ ভিক্ষে করে। ঐ গণ্ডগোলের সময় যারা পুলিশের লাঠি বা বন্দুকে মারা যায়, তাদের মৃতদেহ পর্যন্ত পরিবারের হাতে তুলে দেয় নি পুলিশ। কত মেয়ে আর বাচ্চার খোঁজই পাওয়া যায় নি। পুনর্বাসনের কোনও দাবিতেই সরকার কান দেয় নি।

এই ঘটনা এখনকার মানুষকে অনেকটা সচেতন করে দেয়। জিন্দাল গোষ্ঠীর স্টেইনলেস স্টিলের কারখানা করার সময়ও ঠিক একই পদ্ধতিতে মানুষকে বাস্তুচ্যুত করে। কোনোরকম পুনর্বাসনের দাবিই গ্রাহ্য হয় নি। ছেলেদের কিছুদিনের জন্য জেলে রেখে দেয়। মেয়েদের আর বাচ্চাদের দু-তিন দিনের চিঁড়ে, চাল দিয়ে দেয়। জমির দাম দিয়েছিল। কিন্তু সেই টাকায় ক'দিন চলে! জিন্দাল স্টেইনলেস স্টিলের কারখানার ঘটনাটি ঘটে ২০০৩-এ।

এইসব ঘটনা অঞ্চলের মানুষদের ভাবিয়ে তোলে। ২০০৪-এর ২২ অক্টোবর ১৫ জনকে নিয়ে খুবই ছোট করে একটা মিটিং হয়। সেখানে সকলেই সহমত হয়, নিজেদের একটা সংগঠন খুব জরুরি। তৈরি হয় 'সুখিন্দ্যা উপত্যকা আদিবাসী-হরিজন একতা সুরক্ষা পরিষদ'।

২০০৫-এ টাটা আর মহারাষ্ট্র সিমলেস কোম্পানি জমি চিহ্নিতকরণ শুরু করে। তার আগের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল, ৯৪-৯৫ সালে 'ভূষণ স্টিল প্ল্যান্ট' বানানোর কথা হয়। তখন জমি অধিগ্রহণের জন্য পাকা ধানের ওপর দিয়ে ড্রেজার চালিয়ে দিয়েছিল। ধানটা কেটে নেবার সময়টুকুও দেয় নি। 'ভূষণ স্টিল প্ল্যান্ট' আর এরকো (ERCO, শিল্প নিগম) বলে যে, একরপ্রতি ১ লাখ ৬০ হাজার টাকা দিয়েছি। কিন্তু সেটা একেবারেই মিথ্যে কথা। ওরা মোট ৫ হাজার একর জমি অধিগ্রহণ করেছিল। কিন্তু ৭-৮ বছরে প্ল্যান্ট হয় নি। জমি ঐভাবেই পড়ে ছিল। তারপর যাঁরা চাষ করতেন, তাঁরা আবার জমির দখল নেন। এবং চাষ করতে শুরু করেন। এখনও ঐ জমিতে চাষই হয়। টাটা আর মহারাষ্ট্র সিমলেস কোম্পানি জমি চিহ্নিতকরণের কাজ শুরু করে। প্রথমে রাভনা থেকে খুরুটি করিডোর রোডের জন্য জমি চিহ্নিত করে। কিন্তু এলাকার প্রায় সব মানুষ রাস্তায় নেমে, জমি বাঁচানোর কাজে প্রতিরোধ তৈরি করে। তখন এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি হয়। নোটিশ আসে যে এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা আর শান্তি নষ্ট হচ্ছে। ১০৭ জনের বিরুদ্ধে কেস দেয়। কোর্টে যেতে হয়। ২০০৫-এর ২৬-২৭ মার্চ মিটিং করে সংগঠনের নাম পাল্টে 'বিস্থাপন বিরোধী জনমঞ্চ, সুখিন্দ্যা' নাম দেওয়া হয়। ঐ বছরেই ৬ এপ্রিল মিটিংয়ে হাজার/দেড় হাজার মানুষ আসেন।

এরপর ৯ মে 'মহারাষ্ট্র সিমলেস'-এর পক্ষ থেকে ভূমিপূজা করতে আসে। স্থানীয় মানুষ ভূমিপূজা করতে দেবে না বলে অবস্থান শুরু করে। হাজারখানেক মানুষ এই অবস্থানে অংশ নেন। সকাল থেকে সবাই বসেছিল। বাচ্চা

কোলে মেয়েরাও। বেলা ৪টে পর্যন্ত বসেছিলেন অবস্থানকারীরা। পুলিশ আসে প্রায় ৬/৭ প্লাটুন। জেলাশাসকের দপ্তর থেকে সহকারী জেলাশাসক আসেন। অবস্থান তুলে নিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু একজন লোকও অবরোধ তুলে নেন না। পুলিশ তারপর এসে বলে 'পাঁচ মিনিটের মধ্যে জমি খালি করে না দিলে, লাঠি চলবে'। পুলিশ লাঠি চালিয়ে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। তারপর রাত ৩টের সময় গ্রামে ঢোকে সশস্ত্র পুলিশ। পুরুষরা বুঝতে পেরেই জঙ্গলে পালিয়ে যায়। ২৫ জন মহিলা আর ১৩টি শিশুকে পুলিশ তুলে নিয়ে যায়। যার মধ্যে ১৫ দিনের শিশুও ছিল। কোর্টের আদেশে ২২ দিন জেলে থাকতে হয়।

অত্যাচারের ভয়ে মোট ১৫টি গ্রামের মানুষ গ্রাম ছেড়ে জঙ্গলে পালিয়ে গিয়েছিল। পুলিশ ফাঁকা গ্রামগুলিতে টহল দিত। এই ১৫টি গ্রামই আদিবাসীদের গ্রাম। মূলত মুন্ডারা থাকেন। গ্রামগুলি হল: (১) চান্দিয়া (২) বালিগোট (৩) আরসারি (৪) খড়ি গাটিয়া (৫) গড়পুর (৬) বান্দর গেড়িয়া (৭) গোবর গাটি (৮) বাইডুবুরি (৯) পোড়া মাটিয়া (১০) চম্পাকৈলা (১১) বামিয়া গোঠ (১২) আম্বগাড়িয়া (১৩) বেলহরি (১৪) কঙ্করা আর (১৫) হাতিমুন্ডা-মাসাখিয়া।

মে মাসের গরমে দুটি ১ আর ২ বছরের শিশুর গরমে মৃত্যু হয়। ৯ মে তারিখে পুলিশের লাঠির আঘাত মাথায় নিয়ে জঙ্গলে পালিয়েছিল ৩২ বছরের যুবক সুরেন্দ্র তামসয়। ১২ তারিখে জঙ্গলেই বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু হয়। সুরেন্দ্র ছিলেন চান্দিয়া গ্রামের মানুষ। আর গোবরঘাটি গ্রামের একজন বৃদ্ধ অসুস্থ হয়ে বিনা চিকিৎসায় মারা যান।

এই ঘটনার পর 'মহারাষ্ট্র সিমলেস' আর কারখানা তৈরি করতে আসে নি। কিন্তু তারপর শুরু হয় টাটার কারখানা তৈরির কাজ। ২০০৫-এ অঞ্চল সমীক্ষা করে সিমেন্টের পিলার তৈরি করতে শুরু করে। মাইক বাজিয়ে চাষ বন্ধ করতে বলে। কিন্তু গ্রামবাসী মাইকওয়ালাদের ধাওয়া করে তাড়িয়ে দেয়। ২০০৫-এর ২৩ জুলাই ভূমিপূজা করতে টাটার তরফে লোক আসে। যেই সেই খবর গ্রামে আসে, চারিদিক থেকে ২৫০০ লোক গিয়ে ভূমিপূজা বন্ধ করে দেয়। আবার ৭ আগস্ট পুলিশ আসে ভূমিপূজা করতে। মেয়েরা প্রতিরোধ করতে যায়। পুলিশ মেয়েদের ওপরই লাঠিচার্জ করে। তখন গ্রামের পুরুষরাও এগিয়ে যায়। প্রচণ্ড মারামারি হয়। পুলিশ হঠে যেতে বাধ্য হয়। এরপর 'বিস্থাপন বিরোধী জনমঞ্চ'র পক্ষ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর জাজপুরে একটি কনভেনশন ডাকা হয়। সেই কনভেনশনে বহু মানুষ এসেছিলেন। বলতে গেলে, গোটা ওড়িশার গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষের জমায়েত ছিল সেটি। ফলে গ্রামবাসীদের মনোবল বেড়ে যায়। এরপর বারবার 'টাটা'র লোক জমির দখল নিতে আসে এবং বারবারই গ্রামের মানুষের প্রতিরোধে ফিরে যেতে হয়। এরপর ২০০৬-এর ২ জানুয়ারি পুলিশ আটঘাট বেঁধে আসে। চম্পাকৈলা গ্রামে বুলডোজার নামিয়ে দিয়ে জমি সমান করতে শুরু করে। প্রায় ৫০০ মানুষ পুলিশের সঙ্গে কথা বলতে দৌড়ে যায়। দড়ি দিয়ে ভাগ করা ছিল। দড়ির ওপারে পুলিশের এস পি সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে, আর এপারে নিরস্ত্র মানুষ। ৭ জন এগিয়ে যায় কথা বলতে। পুলিশ গুলি চালাচ্ছিল। তার মধ্য দিয়েই ৭ জন এগোয়। দড়ির ওপারে যেতেই ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণ হয়। এটা কারও ধারণার মধ্যে ছিল না। পুলিশ যে ল্যান্ডমাইন পেতে রাখতে পারে, কেউ ভাবে নি। জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। ৭ জন তক্ষুনি মারা যায়। তার মধ্যে তিনজন মহিলা। দুজন আহত হয়েছিল। একজন যুবক আর একজন বৃদ্ধ। পুলিশ তাদের নিয়ে যায়। জাজপুরে হাসপাতালে ভর্তি করবে এইরকম প্রতিশ্রুতি দেয়। তারা কথা বলছিল তখনও। বৃদ্ধকে জাজপুর হাসপাতালে ভর্তি করে দেয়। যুবকটিকে বলে কটক নিয়ে যাবে। কিন্তু নিয়ে যায় না। যাবার পথে গুলি করে মারে। এ ছাড়া ৩৯ জন ভীষণভাবে আহত হয়েছিল। তার মধ্যে ১৪ জন মারা যায়। পুলিশ মৃতদেহগুলি পোস্টমর্টেম করবে বলে নিয়ে যায়। তারপর যখন ফেরত দেয়, তখন তাদের যৌনাঙ্গ এবং হাত কনুই থেকে কাটা ছিল।

এই ঘটনাটা মিডিয়ার দৌলতে সারা ভারতে প্রচার পায়। এরই মধ্যে ১৪ মাস ধরে রাস্তা বন্ধ রাখেন 'বিস্থাপন বিরোধী জনমঞ্চ'-র সংগঠকরা। সরকার ৬-৭ মাস একেবারে চুপ করে থাকে। এমনকি, এই রাস্তা বন্ধের কর্মসূচিও প্রকারান্তরে মেনে নেয় কারণ ঘুরপথে গাড়ি যেতে থাকে। এই মঞ্চের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়কেরও দুবার কথা হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে ৭টি দাবি করা হয়।

(১) কোনওরকম বিস্থাপন পুনরায় হবে না।

(২) বিস্থাপিত ব্যক্তির জন্য পুনর্বাসন এবং প্রত্যেক পরিবারকে ৫ একর জমি দিতে হবে।

(৩) কলিঙ্গনগরের গুলি চালনা এবং ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণের জন্য দায়ী এস পি এবং কালেক্টরকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করতে হবে এবং খুনের মামলা দিয়ে

জেলে পাঠাতে হবে।

(৪) গুলিতে এবং ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণে মৃতদের জন্য ২০ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

(৫) আহতদের জন্য ১০ লাখ দিতে হবে।

(৬) বহুজাতিক কোম্পানিকে কারখানা করতে দেওয়া হবে না।

(৭) যা কিছু মিথ্যা কেস দেওয়া হয়েছে, সে সব তুলে নিতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী মৃতদের পরিবারকে ১৫ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি হন। আর কেন্দ্রীয় সরকার ৫ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দেয়। মুখ্যমন্ত্রী এলাকা শান্ত হওয়ার জন্য কিছুটা সময় একদম চুপচাপ থাকেন।

কিন্তু এবারের আঘাত আসে অন্যদিক থেকে। 'বিস্থাপন বিরোধী জনমঞ্চ'কে ভেতর থেকে কমজোরি করার জন্য টাটা এবং সরকার একযোগে অন্য একটি সংগঠন তৈরি করার কথা ভাবে। প্রত্যেক গ্রাম থেকে ২-৪ জন লোককে টাকা দিয়ে ভাড়া করে রাখে। এই সংগঠনের নাম হয় 'সপক্ষবাদি'। নানাভাবে একেবারে গুলি করে 'বিস্থাপনবিরোধী জনমঞ্চ'-র সংগঠকদের মেরে ফেলতে শুরু করে কখনও পুলিশ, কখনও টাটার আধিকারিকরা। যেমন, অমিন বানারা, বাউলগড় গ্রামের বড় সংগঠক, রাভানা গিয়ে ফেরার সময় টাটার ঠিকেদার অরবিন্দ সিংহের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন। অরবিন্দ প্রকাশ্য রাস্তায় তাঁকে গুলি করে মারে। কোনও কেসও হয় নি তার বিরুদ্ধে। যোগেন্দ্র জামুদাকে থানার ২০০/৩০০ মিটারের মধ্যে গুলিতে প্রাণ দিতে হয়েছে। কোনও সুরাহা হয় নি।

ঐসবের পাশাপাশি গ্রামে গুণ্ডা পাঠাতে থাকে। গ্রামের লোক একজোট হয়ে থাকতে শুরু করে। একটা গুণ্ডাকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। কিন্তু পুলিশ তাকে ছেড়ে দিয়ে গ্রামবাসীদেরই মিথ্যে মামলায় ফাঁসিয়ে দেয়। যেখানে কাউকে একলা পায়, সে শহরে হোক, হাটে হোক, কলেজ হোক, তাকেই পুলিশ ধরে। এমনকি 'সপক্ষবাদি'দের নিজেদের মধ্যে ঝগড়ার কেসও পুলিশ 'বিস্থাপন বিরোধী জনমঞ্চে'র সদস্যদের বিরুদ্ধে দিয়ে দেয়।

এইসব নানা উপায়ে প্রতিনিয়ত গ্রামবাসীদের উপর অত্যাচার চলতেই থাকে। রাস্তা করার বাহানায় ফসলি জমি অধিগ্রহণ করার কথা বলে। ২০০৯-এর ডিসেম্বরের ২২/২৩ তারিখে এই কাজ শুরুর কথা বলে। রাস্তা থাকা সত্ত্বেও ধানখেতের ওপর দিয়ে রাস্তা কেন হবে? তার একটাই উত্তর। টাটার প্রস্তাবিত কারখানায় যাবার জন্য তাহলে ১ কিলোমিটার রাস্তা কম হবে। এখন যে রাস্তা আছে, তাতে ১ কিলোমিটার বেশি পথ টাটার আধিকারিকদের অতিক্রম করতে হয়। সেই জমিও গ্রামবাসীদের প্রতিরোধের সামনে অনধিগৃহীতই থেকে গেছে। সরকার থেকে বলা হয়েছিল, টাটার কারখানা হলে জায়গাটিরই উন্নয়ন হবে। গ্রামবাসীরা বলেছেন, ১১টি কারখানা এই অঞ্চলকে উন্নত করতে না পারে যদি, তাহলে একটা কারখানা হলেই উন্নয়ন হবে, এ কথার যৌক্তিকতা কী?

কলিঙ্গনগর অঞ্চলটি লাল পাথুরে মাটির জায়গা। এখানে মাটির তলার জল টেনে নিয়ে কারখানাগুলি চলে। ফলে মাটির তলার জল খরচ হয়ে যাচ্ছে। ব্রাহ্মণী নদী শুকিয়ে যাচ্ছে। বেশ কটা ঝরনা ছিল, এখন নেই। ৩৫০ ফুট পর্যন্ত কোনও জল ওঠে না। আগে বড় পুকুর ছিল, যেখানে সারা বছর ধরে জল ধরা থাকত, একটা খাল বা ক্যানাল কাটার কথা ছিল। সে প্রস্তাব সরকার বাতিল করে দিয়েছে। ফলে চাষের কাজে জলের অভাব হচ্ছে। কেবল যে মাটির তলার জল তুলে নেওয়া হচ্ছে, তাই নয়। জঙ্গলও ধ্বংস করছে উন্নয়নের নামে। বৃষ্টির জলও তাই মাটির তলায় খুব কমই ঢুকতে পারে।

এই গোটা অঞ্চলের পুরনো নাম 'সুখিন্দ্যা উপত্যকা', বহু বহু বছর আগে মুন্ডারা জঙ্গল হাসিল করে এখানে জনবসতি স্থাপন করে। এখনকার চাষের এবং বাসের জমি পুরোটাই আদিবাসীদের। কিন্তু বহুবার তদ্বির করা সত্ত্বেও পাট্টা দিয়ে জমির মালিকানা স্থির করে নি সরকার।

কারখানা তৈরির কাজে ফসলি জমি অধিগ্রহণের বিরোধিতা করার পর থেকে এখানকার স্বাস্থ্যকেন্দ্র, প্রাথমিক বিদ্যালয় ইত্যাদি কোনও সরকারি প্রতিষ্ঠানকেই আর সরকারি অনুদান দেওয়া হচ্ছে না। ধীরে ধীরে এগুলি বন্ধ করে দেওয়াই উদ্দেশ্য। এই অঞ্চলের জমির যেহেতু মালিকানা স্থির হয় নি তাই কোনও সরকারি পরিষেবাই দেওয়া যাবে না। কারণ কোনও কর পাওয়া যায় না।

এই ধরনের হাতে না মেরে, ভাতে মারার সরকারি প্রচেষ্টার সামনেও কলিঙ্গনগর ভেঙে পড়ে নি। আত্মরক্ষার তাগিদেই প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে।

(ক্রমশ)

জলাভূমি সমীক্ষার ইতিবৃত্ত

ধ্রুবা দাশগুপ্ত

অনেক বছর আগে, কলকাতার ঐতিহ্যপূর্ণ নিদর্শন নিয়ে কলেজপড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের একটি গবেষণা পড়বার সুযোগ পেয়েছিলাম। সেখানে পড়েছিলাম, কলকাতার ঐতিহ্যসমৃদ্ধ ১৬৪৮টি নিদর্শন আছে। আমার আশ্চর্যের ঘোর এখনও কাটে নি। প্রথমে আমি এটা বিশ্বাসই করতে চাইনি যে মাত্র ৩০০ বছরের কিছু বেশি পুরনো একটি নগরীতে এত ঐতিহ্যমূলক নিদর্শন সত্যিই আছে। কিন্তু পরে মনে হল, সংখ্যাটা যদি একটু কমও হয়, তাহলেই বা কি! এই সব ঐতিহ্য নিয়ে তো খুব কমই লেখা হয়েছে, সংরক্ষণের প্রচেষ্টা হয়েছে আরও কম। ঐতিহ্য সম্পর্কে কলকাতাবাসীর উপলব্ধির বড়ই অভাব।

পূর্বে স্থাপিত ঐতিহ্য বা এগজিস্টিং হেরিটেজ-এর সংরক্ষণ নিয়ে চেতনার যদি এত অভাব থাকে তাহলে জীবন্ত ঐতিহ্য নিয়ে চিন্তাভাবনা তো আরও কমই হবে! পূর্ব কলকাতার জলাভূমির মতন ৮০ বছরের ঊর্ধ্ব, সম্পূর্ণ মানুষের সৃজনশীলতায় এবং লালনপালনে বেড়ে-ওঠা একটি ঐতিহ্য যে হেলায় পড়ে আছে, বর্তমানে তার অস্তিত্বই তো সঙ্কটে! লিভিং হেরিটেজ বা জীবন্ত ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে গেলে তার অন্তর্নিহিত জ্ঞানকে টিকিয়ে রাখা খুব জরুরি। এটা সম্ভবপর হতে গেলে কলকাতা এবং পূর্ব কলকাতার মধ্যে একটা সুস্থ, সুন্দর আদানপ্রদানের সম্পর্ক থাকতে হয়। এই পত্রিকার আগের সংখ্যায় একটি সমীক্ষার কথা উল্লেখ করেছিলাম, যার মাধ্যমে জলাভূমি অধিবাসীদের অস্তিত্ববোধের একটি মূল্যায়ন করা হয়েছিল। এই রকম প্রচেষ্টা এর আগে আর হয় নি। সেই সমীক্ষা এখন সম্পূর্ণ হয়েছে। উঠে এসেছে বহু অজানা তথ্য।

জলাভূমির মাত্র ২.৬৪ শতাংশ অধিবাসীই মনে করেন, কলকাতাবাসী সজাগ হলে এই জলাভূমি টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে তাদের কোনো উপকার হবে। বিশিষ্ট জলাভূমি বিশারদ ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ খুব খাঁটি কথাটি বলেছেন, 'কলকাতাই এই জলাভূমিকে বাঁচিয়ে রাখে তার ময়লা জল দিয়ে, আবার আজ কলকাতাই এই শহরতলির দিকে আগ্রাসী দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে!' যে কাঠামোর ওপর পূর্ব কলকাতার জলাভূমির পরিচালন ব্যবস্থা দাঁড়িয়ে, তাতে যে অতি দ্রুত ভাঙন ধরছে এবং তা কলকাতার পক্ষে সঙ্কটজনক, এটা সমীক্ষার থেকে স্পষ্ট বেরিয়ে আসছে। এই সমীক্ষার ফল নিয়েই একটু পর্যালোচনা করি।

বানতলার কাছে অবস্থিত ভেড়ি দক্ষিণ গরুমারা। এখানকার ২নং সমবায় সমিতি একটি ৬০ বিঘের জলাশয়ে মাছচাষ করে। মালিকানা ব্যবস্থা থেকে সরে গিয়ে বছর ২০ হল এঁরা সমবায় সমিতি করছেন। সম্পাদক কুবির মণ্ডল বললেন, 'আমাদের এখানে বেশিরভাগ মানুষেরই চেতনার খুব অভাব, আমরা তাও জীবন-জীবিকা ধরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছি। কিন্তু আমাদের এত কাছে থেকে কলকাতায় তো এত শিক্ষিত ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি বহু মানুষ আছেন, যাঁরা পরিবেশ সম্পর্কে অন্তত আমাদের থেকে বেশি জানেন। তাঁরা কেন এগিয়ে এসে এই জলাভূমিকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন না! আমরা তো কলকাতাকে বাঁচিয়ে রেখেছি, তার ময়লা জল পরিশোধন করে!' জানি না, কুবিরের প্রশ্নের উত্তর কে দেবে!

পূর্ব কলকাতার জলাভূমি এলাকা জমিদারিপ্রথা থেকে সরকারি আয়ত্তে চলে গিয়েছিল আজ থেকে প্রায় ৪০ বছর আগে। শাসন ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তনের একটা বড় দিক ছিল ভূমিসংস্কার আইন সম্পর্কে প্রচার। নিয়ম হল, ৫১ বিঘার বেশি জলাজমি এই এলাকায় কোনো জলাজমি মালিকের থাকতে পারবে না। কিন্তু এত বছরে একবারের জন্যও মালিকের অংশ সরকারিভাবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয় নি, অথবা সরকারি/ খাসজমি কত পরিমাণ, এটা সরকারিভাবে তথ্য প্রকাশ করার চেষ্টাও করা হয় নি। মালিকেরা তাদের মালিকানার অধিকার সম্পর্কে সঠিকভাবে জানতে পারলেন না। তার একটা ফল এই হল যে, মালিকরা ক্রমশ এই জলাভূমি এবং তার কল্যাণমূলক প্রক্রিয়াগুলিকে (ময়লা জল পরিশোধন, মাছচাষ, সবজিচাষ) চালু রাখার উৎসাহ হারিয়ে ফেললেন। একদল লিজ মালিক তৈরি হল, যারা লগ্নি করা টাকা ফেরত পাবার জন্য যতটুকু করা প্রয়োজন, ততটুকু করে ছেড়ে

দিতে লাগল। ফলে মালিকের আমলে যে প্রতিটা ভেড়িতে অন্তত অল্পসংখ্যক মাছচাষে পারদর্শী লোক ছিল এবং বিশেষ করে ময়লা জল পরিচালনা, খালসংস্কার এবং জলাভূমি রক্ষণাবেক্ষণের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান সচল থাকত, সেটা আস্তে আস্তে ভাঙতে থাকল। আজ ময়লা জল পরিচালনার জ্ঞান আগের থেকে অনেক কমে গিয়েছে।

সমীক্ষার ফল বলছে যে ৪৯.৪৫ শতাংশ জলাভূমি অধিবাসী এবং ভেড়িতে কর্মরত শ্রমিক জানেনই না তাঁরা বৈজ্ঞানিকভাবে ময়লা জল পরিশোধন করেন এবং এই প্রক্রিয়ার দ্বারা কলকাতাবাসী উপকৃত হন। উপরন্তু, ৫১.৪৮ শতাংশ অবগত নন যে তাঁরা যে পদ্ধতিতে দৈনন্দিন মাছচাষ করেন, সেটার পৃথিবীতে একটিই মাত্র দৃষ্টান্ত আছে, সেটা এই জলাভূমিতে।

একদিকে যেমন জ্ঞানের আধার ভেঙে যাচ্ছে, তেমনই অন্যদিকে ভেঙে যাচ্ছে পরিচালন ব্যবস্থা। গত রাজনৈতিক জমানায় জমিদার এবং ভেড়ি শ্রমিকদের মাঝখানে একটি নতুন স্তর তৈরি হয়, যার নাম লিজ মালিক। এই লিজ মালিকদের জমির স্বত্ব ছিল না, কিন্তু অর্থনৈতিক চাপ ছিল কারণ লগ্নির দায়িত্ব ছিল তাদের। তারাও কিছুদিন চালানোর পর দায়িত্ব নিতে নারাজ হলে বেশ কিছু ভেড়ি শ্রমিক ঠিক করেন তাঁরা সমবায় গড়ে ভেড়ি পরিচালনা করবেন। বহু তদ্বির-তদারকের পর যখন কোনোভাবেই এই কাজে সরকারি সহযোগিতা পাওয়া গেল না, তখন শ্রমিকেরা অনথিভুক্ত বেশ কিছু সমবায় তৈরি করলেন। সমীক্ষা করতে গিয়ে দেখেছি, জলাভূমি এলাকায় সমবায় ভেড়িগুলির দশ ভাগের এক ভাগের বেশি সরকারি স্বীকৃতি পায় নি। তাই ভেড়ি পরিচালনের এই গোটা ব্যবস্থার মধ্যে প্রশাসনিক উপস্থিতি প্রায় নেই বললেই চলে।

এত সবের পরেও জলাভূমি সংরক্ষণের দায়িত্ব কিন্তু সরকারের কাছেই আছে। এই জলাভূমি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বীকৃতি পেয়েছে রামসার ওয়েটল্যান্ড অভ ইন্টারন্যাশনাল ইম্পর্টেন্স হিসেবে। রামসারের স্বীকৃতির কিছু প্রশাসনিক নিয়ম আছে এবং সরকারকে বাধ্য হয়েই জলাভূমির সংরক্ষণের জন্য ইস্ট কলকাতা ওয়েটল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অথরিটি (EKWMA) তৈরি করতে হয়েছিল এবং আনুষ্ঠানিকভাবে এই জলাভূমির প্রশাসনিক দায়িত্ব তুলে দিতে হয়েছিল। অথচ সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, শুধুমাত্র ২৪.০৩ শতাংশ উত্তরদাতা EKWMA-র অস্তিত্ব সম্পর্কে জানেন এবং কেবলমাত্র ৭.৩৯ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন যে EKWMA তাদের কোনোভাবে কাজে লাগে। পাঠকদের এই সূত্রে জানিয়ে রাখি, এই প্রতিষ্ঠানটিতে একজনও জলাভূমিবিশেষজ্ঞ নেই, যিনি এই জলাভূমি পরিচালনার কাজে নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে সুষ্ঠুভাবে জলাভূমির উন্নতি সাধন করতে পারবেন।

দুর্দশার এখানেই শেষ নয়। উপরন্তু সঙ্কট আছে দুষ্কৃতীদের ভেড়ি দখল করে নেওয়ার ক্রমাগত হুমকি এবং পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা। এই সব পরিস্থিতি মিলিয়ে গোটা প্রশাসন ব্যবস্থাকেই একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। তাই যেটা হওয়া উচিত ছিল, রামসারের স্বীকৃতি, জলাভূমি সংরক্ষণ এবং জীবিকা নির্বাহের উন্নতি, এই তিনটে জিনিসের কোনো মেলবন্ধন বা সংযোগই সৃষ্টি হল না। সেটা সম্ভব হতে গেলে সরকারের আরও অনেক গঠনমূলক এবং ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে হত। জলাভূমির মানুষও তাদের জীবিকা নির্বাহের তাগিদেই জলাকে আরও ভালভাবে ব্যবহার করত এবং তার ফলে জলাভূমি আরও ভালভাবে সংরক্ষিত হত। সমীক্ষা করতে গিয়ে দেখতে পেয়েছি যে ৩৭.২৭ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন যে ভবিষ্যতে ভেড়ি বাঁচানো যাবে না। আইনের ওপর তাঁদের কোনো আস্থাই নেই। শুধুমাত্র ২০.১১ শতাংশ মৎস্যজীবী মনে করেন, ১৯৯২ সালের জমির চরিত্র পরিবর্তনের যে নিষেধাজ্ঞা কলকাতা হাইকোর্ট জারি করেছিল, তা আদৌ কোনো কাজে দিয়েছে।

একটা কথা খুবই কম আলোচিত হয়, জলাভূমি এলাকায় শিক্ষার অভাব। সারা পশ্চিমবঙ্গে অশিক্ষার হার যেখানে ৩৬.৯৪ শতাংশ, জলাভূমি এলাকাতে এই হার একলাফে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৯.৭ শতাংশ। প্রায় ৩ শতাংশ বেশি। আমরা শিক্ষার হার আর জলাভূমির ব্যাপারে গুরুত্ববোধের কোনো সোজাসুজি সম্পর্ক আছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে পারি নি। কিন্তু এটুকু অবশ্যই দেখেছি যে বহু অশিক্ষিত জলাভূমি অধিবাসীকে ভুল বুঝিয়ে তার মাছচাষের অধিকার ছেড়ে দিতে বাধ্য করা হচ্ছে, কোথাও বা ময়লা জলে তৈরি খাবার ধানচাষের জমি ছেড়ে দিতে বলা হচ্ছে। এটা খুবই আশঙ্কাজনক। সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে ৪০.২২ শতাংশ উত্তরদাতার মাছচাষ ছাড়া বিকল্প রোজগারের উপায় নেই।

প্রবল অস্তিত্বের সঙ্কটের মধ্যে কিছু অদ্ভুত স্ববিরোধী চিত্র ফুটে উঠেছে। সমীক্ষায় উত্তরদাতা ৯০.৫২ শতাংশ

মৎস্যজীবী মনে করেন যে মাছচাষ লাভজনক এবং তাঁরা এই নিয়েই টিকে থাকতে চান। কিন্তু ভেড়ি ভালভাবে পরিচালনার জন্য যে লগ্নির প্রয়োজন হয়, ৮৩.৩৬ শতাংশ উত্তরদাতা তাঁদের ভেড়ির জন্য কোনো সরকারি বা বেসরকারি সংস্থার কাছে কোনো অর্থের আবেদন করেন নি। অধিকাংশ সময়েই যখন আমরা প্রথমবার মৎস্যজীবীদের এই অর্থসংক্রান্ত প্রশ্ন করেছি, উত্তর পেয়েছি যে তাঁরা এ ব্যাপারে কিছুই জানেন না, সবটাই শুধু ভেড়ি পরিচালনা কমিটিই জানে। অর্থের জোগান আসে একমাত্র আড়ত থেকে, যেখান থেকে তাঁরা দাদন পান। দুটো জিনিস ভেবে খুব খটকা লেগেছিল, প্রথমত, ভেড়ি পরিচালনার কাজে, ভেড়ির ভাল-মন্দে সাধারণ মৎস্যজীবী শ্রমিকদের আগ্রহের অত্যন্ত অভাব। এই অবস্থায় ভেড়ি পরিচালনা দুর্নীতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে। দ্বিতীয়ত, আড়তের লগ্নির ক্ষমতা সীমিত এবং কোনো প্রাতিষ্ঠানিক সংস্থার তুলনায় দুর্বল। তাই ভেড়িগুলির ব্যবসা খুব বেশি বাড়তে পারে নি। আমরা সমীক্ষা করা ভেড়িগুলির মাসিক অর্থনৈতিক খতিয়ান থেকে পেয়েছি যে তাদের মধ্যে অধিকতম মাসিক লাভ ২,৮১,৬৭৬ টাকা, এটা খুবই ক্ষুদ্র একটি সংখ্যা। ভবিষ্যতে জনসংখ্যায় বর্ধিত কলকাতাবাসীর ময়লা জল নিখরচায় পরিশোধিত হতে গেলে মাছের ব্যবসা আয়তনে বাড়াতে হবে এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অর্থলগ্নির খুবই প্রয়োজন।

পূর্ব কলকাতার জলাভূমির মানুষদের নিয়ে এই সমীক্ষা আমাদের সামনে সবচেয়ে বেশি তুলে ধরেছে তাদের চেতনার অভাব। এদের কাজের ফলে সুবিধাভোগী আমরা কলকাতার নাগরিকরা, তাই এই ব্যাপারে আমাদের দায় এড়িয়ে যেতে পারি না। এই 'জলাভূমি সমাজ' জলাভূমির থেকে যত বেশি দূরত্ব অনুভব করবে, ততই কলকাতাবাসীর ময়লা জল পরিশোধনের নিশ্চিন্ততা এবং তাকে ঘিরে জীবনধারণ ব্যাহত হবে। ভবিষ্যৎ অন্ধকার দূর হোক, মনে মনে এইটাই চাই।

উল্লেখ্য, এই সমীক্ষা হয়েছে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অভ সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ-এর দেওয়া অর্থে। এটি ইস্টার্ন রিজিওনাল সেন্টারে অবস্থিত।

উমা

চৌদ্দপণ

১ পাতার পর

লেখা লিখ্‌ব
পড়া শিখ্‌ব
তবু বাবু ব'নে উঠ্‌ব না;
গ্রামে জেলায়
জলে হেলায়
কভু পানা ঘাস রাখ্‌ব না।।
দেশ ঘুর্‌ব
জ্ঞান পুর্‌ব
জাতি ভেদাভেদ মান্‌ব না;
ভালো বাস্‌ব
দুখ্‌ নাশ্‌ব
কভু ছোট বড় বাছ্‌ব না।।
ধন গড়্‌ব
গাড়ী চড়্‌ব
কারো হানি কভু কর্‌ব না;
পেয়ে লক্ষ
হলে যক্ষ
তবু গরীবেরে ভুল্‌ব না।।

নবকলেবরে

বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান

'বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান' অনেক দিন নিঃশেষিত। দুই খণ্ডের 'বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান' পরিমার্জিত হয়ে একখণ্ডে প্রকাশিত হতে চলেছে। আপাতত যন্ত্রস্থ।

ঠাণ্ডা ঘরে থাকলে মোটা হয়ে যায় কী?

গৌতম মিস্ত্রী

অনেককেই বলতে শোনা যায়, ঠাণ্ডা খাবার খেলে আর ঠাণ্ডা ঘরে (এয়ারকন্ডিশন্ড) থাকলে লোকে মোটা হয়ে যায়। এন্তার আইসক্রিম আর কোল্ড ড্রিংক্স খাওয়া এবং ঠাণ্ডা গাড়ি আর বাড়িতে থাকায় অভ্যস্ত, বৈভবে মোড়া লোকজনদের দেখে এমনটা মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু সত্যিই কি এর কোনো যুক্তিগ্রাহ্য ভিত্তি আছে? যদিও কেবল তথ্যভিত্তিক কোনো পরিসংখ্যান নেওয়া হলে এই ঠাণ্ডাবিলাস আর স্থূলতার সহাবস্থান নজরে পড়বে। তবু এই দুইয়ের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক আছে কি না এটা ভেবে দেখার বিষয়।

সাধারণ পদার্থবিদ্যার জ্ঞান থেকে বরং উল্টোটা সম্ভব মনে হতে পারে। মানুষ মোটা হয় শরীরে অতিরিক্ত মেদ জমে যাবার জন্য। মেদ জমা-খরচের হিসাব একটি সরল পাটীগণিতের সূত্র মেনে চলে। খাওয়াদাওয়ার মাধ্যমে শরীরে ব্যবহারযোগ্য শক্তি চর্বি হিসেবে সঞ্চিত হতে থাকে। হেঁটে চলে বেড়ানো, কথা বলা ইত্যাদি ঘর ও বাইরের দৈনন্দিন কাজে অথবা রুটিরুজির প্রয়োজনে আমাদের কিছু শারীরিক পরিশ্রম হয়। অর্থাৎ, আমাদের কিছু শক্তি খরচ করতে হয়। যাদের রোজগারের চিন্তা নেই, তাদেরও শ্বাস নেওয়া বা হৃদস্পন্দনের জন্য, অর্থাৎ কেবল বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম কিছু শক্তি খরচ করতেই হয়। এই খরচের বহর ব্যক্তিভেদে ফারাক হতে বাধ্য। যেটা মোটামুটি স্থির থাকে, সেটা হল শক্তি সঞ্চয়ের প্রক্রিয়া। আমাদের খাদ্যাভ্যাসের, খাদ্যরুচির আর খাদ্য নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য পারিবারিক, সাংস্কৃতিক ও আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী ঠিক হয়।

প্রতিদিন আমাদের সব রকম শারীরিক শ্রমের জন্য যেটুকু শক্তি প্রয়োজন, সদ্য খাওয়া খাবার থেকে শরীর সেই প্রয়োজন মিটিয়ে নেয়। বয়স ও সচ্ছলতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দৈনিক শ্রমের প্রয়োজন ক্রমশ কমতে থাকে, খাওয়ার পরিমাণ আর খাদ্যের পুষ্টিগুণ পাল্টায় না। বরং, খাবারের পুষ্টিগুণ বাড়তে থাকে, বাড়তে থাকে তার পরিমাণ অনুযায়ী শক্তির ঘনত্ব (increased density of energy in foods)। ঠাণ্ডা হাওয়া খাওয়া গেলেও ঠাণ্ডা খাবার বলতে সাধারণত আইসক্রিম আর সফ্‌ট ড্রিংক্সের কথাই বোঝায়। আর্থ-সামাজিক অবস্থা একই রকম হলে, নিছক ঠাণ্ডা হাওয়া বা খাবার শরীরে ঢুকলে পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মে সেই বস্তুগুলোকে শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রায় নিয়ে যাওয়ার জন্য কিছু শক্তি খরচ করতেই হয়। সরল পাটীগণিতের নিয়মে এটা মোটা ব্যক্তিকে রোগা করতে সাহায্য করার কথা। একটু গোড়ার কথা মনে করে নিই। গরম হোক বা ঠাণ্ডা, হজম হওয়া খাবার শরীরের শক্তির উৎস। এই খাবারের এক অংশ তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে খরচ হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়। ব্যক্তিবিশেষের শক্তি খরচের প্রয়োজন অনুযায়ী এর মাত্রা নির্ভর করে। শৈশবে এর মাত্রা বার্ধক্যের চেয়ে বেশি। আবার ঠাণ্ডাঘরে চেয়ারে বসে কাজ করা ব্যক্তির চেয়ে শারীরিক শ্রমনির্ভর ব্যক্তির শক্তির প্রয়োজন বেশি।

গরম হোক বা ঠাণ্ডা, হজম হওয়া খাবার শরীরের শক্তির উৎস। এই খাবারের এক অংশ তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে খরচ হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়। ব্যক্তিবিশেষের শক্তি খরচের প্রয়োজন অনুযায়ী এর মাত্রা নির্ভর করে। শৈশবে এর মাত্রা বার্ধক্যের চেয়ে বেশি। আবার ঠাণ্ডাঘরে চেয়ারে বসে কাজ করা ব্যক্তির চেয়ে শারীরিক শ্রমনির্ভর ব্যক্তির শক্তির প্রয়োজন বেশি।

শারীরিক শ্রমনির্ভর ব্যক্তির শক্তির প্রয়োজন বেশি। খাবারের দ্বিতীয় অংশ অদূর ভবিষ্যতে অভুক্ত অবস্থায় শক্তি উৎপাদনের জন্য সাময়িকভাবে যকৃতে গ্লাইকোজেন হিসাবে ও যকৃত বা লিভারের ধারণক্ষমতা পূর্ণ হয়ে গেলে পেট আর চামড়ার নিচে চর্বি হিসাবে জমা হয়। পড়ে-থাকা তৃতীয় অংশ শরীরের বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণের কাজে লাগে। সুতরাং একদিকে খাবারের মাধ্যমে শক্তি জমা হতে থাকে আবার ন্যূনতম শারীরিক প্রয়োজনে আর কাজকর্মের জন্য শক্তি খরচ হতে থাকে। জমা-খরচের হিসাব সমান সমান হলে শরীরের ওজন বাড়বেও না, কমবেও না। এই হিসেব-নিকেশের জন্য খাবার আর কাজের একটা একক ধরে নেওয়া হয়, যাকে বলে 'ক্যালোরি'। এক ক্যালোরি শক্তি হল সেই পরিমাণের শক্তি, যাকে তাপে রূপান্তরিত করলে সেই শক্তি ১ গ্রাম বিশুদ্ধ জলের তাপমাত্রা ১ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বাড়াতে পারে। পুষ্টি অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকারের খাবারের শক্তি জোগানের ক্ষমতাও ভিন্ন হয়। কাজের রকমভেদেও শক্তি খরচের বহর ভিন্ন।

দুটো আপাত বিভ্রান্তিকর বিষয় আছে। প্রথমত, কেবল তাপমাত্রা ভেদে কোনো খাবারের শক্তি সরবরাহের মাত্রায় ফারাক হয় কি না? দ্বিতীয়ত, মোটা থেকে রোগা হওয়ার কোনো ম্যাজিক সূত্র আছে কি? ধরা যাক, আপনি ঠাণ্ডা জল খেলেন। পদার্থবিজ্ঞানের সূত্র অনুযায়ী স্বাভাবিক তাপমাত্রার জল ঠাণ্ডা করে খাওয়ার ফলে আপনার রোগা হওয়ার কথা। কেন আর কতটা রোগা হওয়া যায় সেটা হিসেব করা যাক।

বরফ দেওয়া জলপানে রোগা হওয়া যায় কী?

যাঁরা ওজন কমানোর জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তাঁরা হয়তো শুনে উল্লসিত হবেন, বিজ্ঞানের সূত্র অনুযায়ী বরফ খেলে রোগা হওয়া যায়। কিন্তু অল্পস্বল্প ওজন কমানোর জন্য কতটা পরিমাণে বরফ খেতে হবে সেটা জানলে মন খারাপ হতে পারে। যখন আমরা বরফ বা অন্য কিছু ঠাণ্ডা খাবার খাই, সেগুলোকে শরীরের তাপমাত্রায় উন্নীত করার জন্য শরীরকে কিছু শক্তি খরচ করতে হয়। এবার কিন্তু একটু অঙ্ক কষতে হবে। প্রথমেই জেনে নেওয়া যাক, ইংরেজিতে ক্যালোরির প্রথম অক্ষর যদি ছোট হাতের 'সি' হয় তবে সেই মাপের এক ক্যালোরির শক্তি ১ গ্রাম বিশুদ্ধ জলের তাপমাত্রা ১ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বাড়ায়। খাবারের প্যাকেটে ক্যালোরির যে মান দেখি বা জিমনেসিয়ামে ব্যায়াম করার সময় ট্রেডমিলে ক্যালোরি খরচের যখন হিসাব করি তখন যে ক্যালোরির কথা বলি সেই ক্যালোরির ইংরেজি শব্দের প্রথম অক্ষর বড় হাতের 'সি'। এই ক্যালোরি আসলে কিলোক্যালোরি, অর্থাৎ সেই পরিমাণের শক্তি যেটা কিনা ১ কিলোগ্রাম বিশুদ্ধ জলের তাপমাত্রা ১ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বাড়ায়। অর্থাৎ বরফকে গরম করার ক্যালোরির চেয়ে শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ার হিসাবনিকেশের ক্যালোরির পরিমাণ ১ হাজার গুণ বড়। ওজন কমানোর লক্ষ্যে খাবারের বা ব্যায়ামের যে ক্যালোরির হিসেব আমরা সচরাচর করে থাকি সেটা আসলে কিলোক্যালোরি। জনপ্রিয় ১ ক্যান (১২ আউন্স বা ৩৫৫ মিলিলিটার) ঠাণ্ডা কোলা পানীয়ে ১৪০ কিলো ক্যালোরি বা ১৪০০০০ ক্যালোরি জোগান দেওয়ার মতো চিনি থাকে। এই ক্যালোরি খরচ করার জন্য অন্তত দেড় কিলোমিটার দৌড়তে হবে। অথচ ফ্রিজ থেকে বার করা ৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের ৩৫৫ মিলিলিটার পানীয়কে যদি থর মরুভূমির গ্রীষ্মের দুপুরে (৪৬ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড) খাওয়া হয় তবে এই ৩৫৫ মিলিলিটার পানীয়কে ৮ থেকে ৪৬ ডিগ্রিতে পরিণত করার জন্য মাত্র ১৩ কিলোক্যালোরি খরচ হবে। সেই কারণে যদি কেউ পরখ করে দেখবার জন্য ওজন কমানোর জন্য ঠাণ্ডা পানীয় পান করতে চান তবে কেবল ঠাণ্ডা জলের ওপর নির্ভর করতে হবে, সফট ড্রিংক্স পান করা চলবে না।

ধরা যাক আপনি রোগা হতে চাইছেন। প্রতি মাসে খুব বেশি হলে ২ কিলোগ্রাম করে ওজন কমানো স্বাস্থ্যসম্মত। এই ২ কিলোগ্রাম ওজন আবার কেবল চর্বির বোঝা থেকেই ঝরাতে হবে। অর্থাৎ, প্রতি মাসে ২ কিলো করে চর্বি শক্তি হিসাবে খরচ করে ফেলতে হবে। একটা ঋণাত্মক শক্তি জমা-খরচের হিসাব (negative energy balance) অনুযায়ী খাওয়া আর শারীরিক শ্রম করে যেতে হবে। দৈনিক শ্রমজনিত শক্তি খরচের চেয়ে খাবারের মোট শক্তি বা ক্যালোরির পরিমাণ কমাতে হবে। প্রশ্ন হল, কতটা কম? খাদ্যের মূল তিনটি উপাদানের মধ্যে ফ্যাট (চর্বি) অন্য দুইটি উপাদানের (শর্করা ও প্রোটিন) চেয়ে বেশি শক্তিঘন। ১ গ্রাম চর্বি ৯ (কিলো) ক্যালোরি বা ৯০০০ ক্যালোরি শক্তি জোগান দেয়। অর্থাৎ এক মাসে ২ কিলোগ্রাম চর্বি ঝরানোর জন্য প্রতি মাসে ধারাবাহিক

যে সৌভাগ্যবান (!) ঠাণ্ডা ঘরে বসবাস করেন, আসতে যেতে ফ্রিজ থেকে ঠাণ্ডা পানীয় আর আইসক্রিম খান এবং তাঁর রুটিরুজির জন্য বাসের হ্যান্ডেল ধরে বাদুড়ঝোলা হয়ে শহর চষে বেড়াতে হয় না, তার ঐ ঠাণ্ডা পদার্থগুলো শরীরের মধ্যে ঢোকানোর জন্য নগণ্য কিছু শক্তি (ক্যালোরি) খরচ হয় বটে, কিন্তু ঐ ঠাণ্ডা সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত অন্যান্য জীবনশৈলীর জন্য হরেদরে তার মোট ক্যালোরি জমা-খরচের হিসাবে লাভের ঘরেই ক্রমাগত ক্যালোরি জমা হতে থাকে। ঠাণ্ডা তার ওজনের ভগ্নাংশ কমানোর আশ্বাস দিলেও আনুষঙ্গিক কারণে তাতে মোটা হতেই হয়।

ভাবে ২০০০×৯০০০ বা ১,৮০,০০,০০০ ক্যালোরি (বা ১৮০০০ কিলোক্যালোরি) ঋণাত্মক ব্যালেন্স অনুযায়ী চলতে হবে। প্রতিদিন আপনার ক্যালোরি খরচের কোটা হল ১,৮০,০০,০০০০/৩০ বা ৬,০০,০০০ ক্যালোরি (বা ৬০০ কিলোক্যালোরি)। ধরে নিচ্ছি আপনি রবিবারেও প্রার্তভ্রমণকে ছুটি দিচ্ছেন না, শনিবারের বারবেলাতে সিঙাড়া খাচ্ছেন না, অফিসের বড়বাবুর খুড়তুতো শ্যালিকার বিয়েবাড়িতে গিয়ে আপনি একটা শশা চিবিয়েই বাড়ি ফিরে এলেন। এবার হিসেব কষা যাক দৈনিক ৬,০০,০০০ ক্যালোরি খরচ কত লিটার হিমশীতল ফ্রিজ থেকে সদ্য বার করা জল আপনাকে পান করতে হবে। ১ লিটার বিশুদ্ধ জলকে ৮ থেকে ৪৬ ডিগ্রিতে পরিণত করার জন্য অর্থাৎ তাপমাত্রা ৩৬ ডিগ্রি বাড়ানোর জন্য ৩৬০০০ ক্যালোরি বা ৩৬ কিলোক্যালোরি শক্তি শরীরকে খরচ করতে হয়। অর্থাৎ দৈনিক ৬,০০,০০০ ক্যালোরি খরচ করার জন্য কেবল ঠাণ্ডা থেরাপির জন্য প্রতিদিন মাত্র ৬০০০০০/৩৬০০ বা ১৬.৬ লিটার ৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার জল পান করতে হবে। এটা মোটেই বাস্তব সম্মত নয়। শুধু তাই-ই নয়, পেটের মধ্যে সেঁধনো এই জলের অতিরিক্ত বোঝাকেও শরীর আদি অনন্তকাল ধরে শরীরে জমিয়ে রাখতে পারে না। কিডনির ওপর চাপ পড়ে। কিডনি রোগবিহীন ও শক্তিশালী না হলে তো বিপদ আছেই, সুস্থ কিডনিরও প্রস্রাবের মাধ্যমে অতিরিক্ত জল বের করে দেওয়ার ক্ষমতার একটা সীমা আছে। রাতের ঘুমের বারোটা বাজতে পারে। ঠাণ্ডা ঘরে সময় কাটালে বা কম ঘামলে ওজনের হেরফের হবে কি? গরমে ঘেমে নেয়ে শারীরিক পরিশ্রম করলে ওজন কমে এটা সত্যি। যদি কেউ এয়ারকন্ডিশন্ড জিমন্যাসিয়ামে না ঘেমেনেয়ে ট্রেডমিলে হাঁটেন তবে সেই ওজন কমার সঙ্গে খোলা মাঠে একই মাত্রার শরীরচর্চা করলে ওজন কমার পার্থক্য হবে কি? কেউ কেউ বলে থাকেন, 'ঘাম ঝরিয়ে ব্যায়াম করলে বেশি ওজন কমানো যায়। ডাক্তারবাবু তো প্রত্যেকবার ওজন কমানোর কথা বলছেন। কিন্তু বলুন তো, ব্যায়াম করি কোন কালে? আমাদের এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে গরমে হিট স্ট্রোকের সমস্যা আছে, বর্ষাকালে সর্দিকাশি আছে, আর আছে সুদীর্ঘ বায়ু পরিবর্তনের স্পর্শকাতর কাল। খোলামাঠে নির্ঝঞ্ঝাটে ব্যায়ামের অনুকূল সময় পাওয়াই দুষ্কর। যদিও আমরা অনেকেই জানি, ঘাম না ঝরালে/হবে না রোগা ছেলে ...'

এবার একটা খুশি হবার মতো কথা শোনাই। না, ক্যালোরির জমা-খরচের হিসাবের মধ্যে ঘামের কোনো অবদান নেই। বরং, ঠাণ্ডাঘরে ব্যায়াম করার জন্য শারীরিক শ্রম ছাড়াও কেবল শরীরের তাপাঙ্ক স্বাস্থ্যকর নিম্নসীমায় ধরে রাখার জন্য নগণ্য হলেও শরীরকে কিছুটা অতিরিক্ত শক্তি খরচ করতে হয়। অর্থাৎ শক্তি খরচ করে ঠাণ্ডা পরিমণ্ডলে শরীরকে গরম করতে হয়। ঠাণ্ডা জল পানের মতো ঠাণ্ডা তাপাঙ্কের পরিমণ্ডলে থাকার জন্য অল্প পরিমাণে হলেও ক্যালোরি খরচ হয়ে যায়। কারণ শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়াকলাপ সুসম্পন্ন হওয়ার জন্য, ক্যালোরি খরচের দ্বারা, শরীরের আভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা একটা ন্যূনতম নিম্নসীমার ঊর্ধ্বে রাখতে হয়। অর্থাৎ যদি সুযোগ বা সঙ্গতি থাকে, 'গরমে ঘাম হবে না,

তাই কাজও হবে না', এমনটা না ভেবে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ব্যায়ামাগারে অ্যারোবিক ব্যায়াম করে যান। সব সেলিব্রিটিরা এমনটাই করে থাকেন।

এসব বোঝার পরে সঙ্গত কারণেই মোটা হওয়ার কারণ হিসেবে ঠাণ্ডা খাবার আর ঠাণ্ডা ঘরে থাকার কারণকে ভিলেন মনে করবেন না। ঠাণ্ডা খাবার খাওয়ার আর ঠাণ্ডা ঘরে থাকার মানুষগুলো অবশ্য মোটাই হয়ে থাকে, তবে সেটা অন্য কারণে। ঠাণ্ডা তাপমাত্রা আর স্থূলতার সহাবস্থানের অস্তিত্ব ঘোর বাস্তব কিন্তু কারণ আলাদা।

পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মে রোগা বা মোটা শরীরের নিয়ন্ত্রক আমাদের শরীরের শক্তির চাহিদা আর যোগানের সাম্যতার হেরফের। আমাদের শরীরকে খাটানোর বা না-খাটানোর হরেক রকমের উপায় আমাদের হাতের গোড়ায়। রুচি আর অভ্যাস অনুযায়ী আমরা দৈনন্দিনের রোজনামচা অনুসরণ করি। এক গ্লাস জলের প্রয়োজন হলে কেউ হুকুম জারি করেন আবার কেউ বা নিজে জল গড়িয়ে পান করে থাকেন। এই অভ্যাসের হেরফের খুব একটা প্রচ্ছন্ন নয়, চট করে খেয়াল হয় না। যে সৌভাগ্যবান (!) ঠাণ্ডা ঘরে বসবাস করেন, আসতে যেতে ফ্রিজ থেকে ঠাণ্ডা পানীয় আর আইসক্রিম খান এবং তাঁর রুটিরুজির জন্য বাসের হ্যান্ডেল ধরে বাদুড়ঝোলা হয়ে শহর চষে বেড়াতে হয় না, তার ঐ ঠাণ্ডা পদার্থগুলো শরীরের মধ্যে ঢোকানোর জন্য নগণ্য কিছু শক্তি (ক্যালোরি) খরচ হয় বটে, কিন্তু ঐ ঠাণ্ডা সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত অন্যান্য জীবনশৈলীর জন্য হরেদরে তার মোট ক্যালোরি জমা-খরচের হিসাবে লাভের ঘরেই ক্রমাগত ক্যালোরি জমা হতে থাকে। ঠাণ্ডা তার ওজনের ভগ্নাংশ কমানোর আশ্বাস দিলেও আনুষঙ্গিক কারণে তাতে মোটা হতেই হয়।

'ঠাণ্ডা জল ও খাবার খেলে অথবা অতিরিক্ত সময় ধরে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পরিমণ্ডলে থাকাই ওজন বৃদ্ধির প্রধান কারণ'-এর মতো প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখেও বলতে হচ্ছে, পরোক্ষভাবে এই সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত ব্যক্তিদের ওজন বাড়ার অন্য জোরালো কারণ বিস্তর। ঠাণ্ডা জলবায়ু যৎকিঞ্চিৎ ওজন কমালেও সেটা অতি নগণ্য। এই আয়েশি সংস্কৃতি, সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এই ঠাণ্ডা জলবায়ুর সঙ্গে বয়ে আসা অস্বাস্থ্যকর জীবনশৈলী। সেটাই মোটা করে দেওয়ার অন্যতম কারণ।

উমা

বজ্রপাত

বিবেক সেন

বজ্রের গম্ভীর আওয়াজ আমাদের চমকিত করে, বুককে কাঁপিয়ে দেয়। কিন্তু দূর থেকে দেখা কালো মেঘের কোলে আঁকাবাঁকা উজ্জ্বল আলোর আলপনা মনে হয় যেন প্রকৃতির এক শিল্পকর্ম। আবার এটাই যখন পৃথিবীর বুকে আঘাত করে ঘটায় কোনো প্রাণীর মৃত্যু, ক্ষতি করে বাড়ি ও সম্পত্তির, দাবানল সৃষ্টি করে জ্বালিয়ে দেয় বনের পর বন তখন এই আপাত মনোহর শিল্প নেমে আসে প্রকৃতির অভিশাপ রূপে। মানুষকে ভাবিয়ে তোলে কী করে এর থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা শুরু হয়। আজকের দিনে স্থাণু বিদ্যুৎকণা (স্ট্যাটিক ইলেকট্রিক চার্জ) ও বিদ্যুৎ প্রবাহকে (ইলেকট্রিক কারেন্ট) আমরা ভৃত্যের মতো ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু প্রায় ৩০০ বছর আগে, আমাদের আলোচ্য সময়ে, বিজ্ঞানীরা প্রধানত স্থাণু বিদ্যুৎকণার গবেষণাতেই ব্যস্ত ছিলেন। জেনেছিলেন দুই বিপরীতধর্মী কণার কথা, যাকে এখন আমরা ধনাত্মক ও ঋণাত্মক কণা (পজিটিভ ও নেগেটিভ চার্জ) বলে থাকি। যাই হোক, সে যুগেও এই ইলেকট্রিক চার্জ-কে সঞ্চিত করে রাখা হত বিদ্যুৎ-ধারককে (ক্যাপাসিটার)। চার্জ-ভর্তি বিদ্যুৎ-ধারকের খুব কাছে বিদ্যুৎ পরিবাহী কোনো কিছু নিয়ে গেলে ধারকটি থেকে বিদ্যুৎকণা লাফিয়ে তাকে স্পর্শ করে, বের হয় একটা আলোর ফুলকি। তাঁরা দেখেছেন মানুষ ধারকটিকে স্পর্শ করলে পাচ্ছেন ইলেকট্রিক শক।

এই অভিজ্ঞতা থেকে সে যুগে মনে হয়েছিল, তবে কি বজ্রগর্ভ মেঘ বিদ্যুতের এক বিরাট ভাণ্ডার! তখন ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দ। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন আমেরিকার একজন সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রতিভাবান ব্যক্তি। বেঞ্জামিন দাবি করেন, মেঘের ভেতর ঘুড়ি পাঠিয়ে সেখানে যে বিদ্যুৎকণা জমে আছে তিনি তার প্রমাণ পেয়েছেন। এই পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি করতে গিয়ে কয়েকজন বিজ্ঞানী তড়িদাহত হয়ে মৃত্যু বরণ করলেন।

বজ্রগর্ভ মেঘ যে বিদ্যুতের ভাণ্ডার সেটা বিজ্ঞানীরা স্বীকার করে নিলেন। কিন্তু বেঞ্জামিন আদৌ পরীক্ষাটা করেছিলেন কি না সে বিষয়ে আধুনিক বিজ্ঞানীরা সন্দেহ প্রকাশ করেন। কারণ পরীক্ষার সময় তাঁর তড়িদাহত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। সন্দেহের দ্বিতীয় কারণ এই পরীক্ষার সময় তাঁর পুত্র উইলিয়াম ছাড়া অন্য কোনো সাক্ষী সেখানে উপস্থিত ছিলেন না।

এরপর আরো কয়েক দশক সময় পেরিয়ে গেল। নতুন নতুন উদ্ভাবন বিজ্ঞানীদের আকাশ তত্ত্ব অনুসন্ধানের নানা উপায় জুগিয়ে দিল। যেমন প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি জুড়ে গ্যাসভর্তি বিরাটাকার বেলুন বজ্রমেঘের ভিতর পাঠিয়ে বিদ্যুৎ। মাটির চেয়ে গাছের মাথা মেঘের আরো কাছে বলে বিদ্যুৎকণার সংখ্যাও সেখানে বেশি (চিত্র ১ খ)।

বিদ্যুৎকণার আর একটি ধর্ম হল বিপরীতধর্মী কণাগুলি পরস্পরকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণের ফলে মেঘের ঋণাত্মক ও মাটির বুকে এগিয়ে থাকা ধনাত্মক বায়ুর ভেতর দিয়ে এসে মিলিত হতে চায়। কিন্তু বায়ু বিদ্যুতের কুপরিবাহী, তাই একটা প্রচণ্ড বাধার সৃষ্টি করে। কণাগুলির পরিমাণ যথেষ্ট বেড়ে আকর্ষণের শক্তি যখন প্রবল হয়ে যায় তখন বায়ুকে হার মানতে হয়। সৃষ্টি হয় বিদ্যুৎকণার এক অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ। নেমে আসে পৃথিবীর বুকে বজ্রাঘাত (চিত্র ১ গ)।

মেঘের ভিতরে জমে ওঠা বিদ্যুৎকণা বজ্রপাতের কারণ

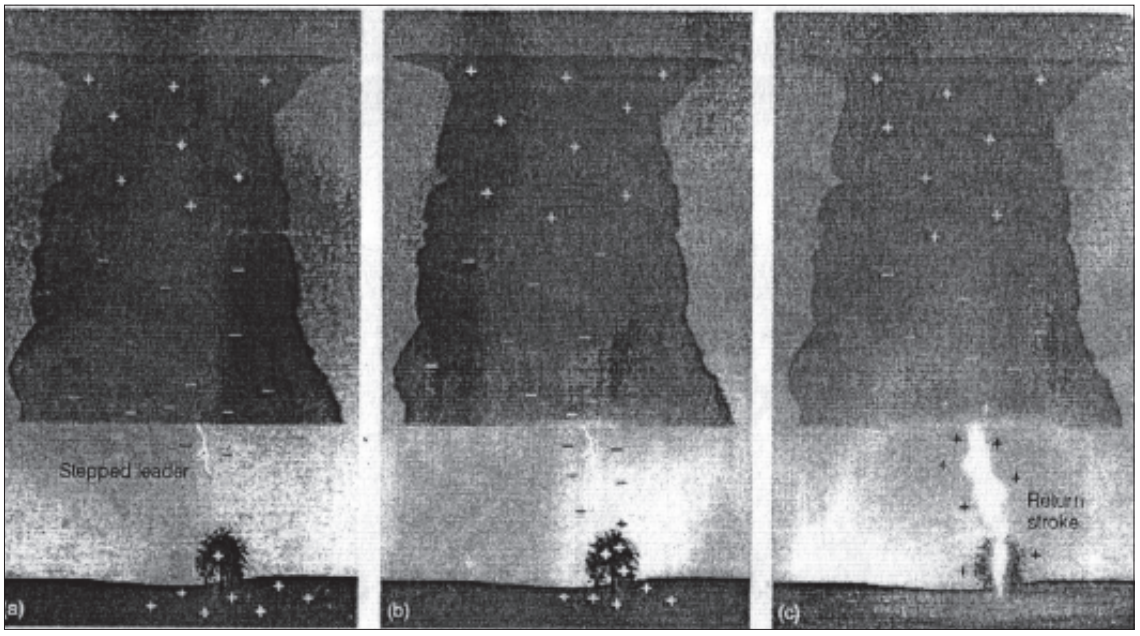

চিত্র ১ (ক) (খ) (গ)

জানা গেল বিদ্যুৎ কণাগুলির চরিত্র, সেগুলি ধনাত্মক না ঋণাত্মক; জানা গেল কণাগুলির বন্টনশৈলী। দেখা গেল মেঘের শীর্ষদেশে, শীতলতম অঞ্চলে, বরফকণাগুলি ছড়িয়ে আছে ধনাত্মক বিদ্যুৎ সংযুক্ত হয়ে। নীচের অংশ দখল করে আছে ঋণাত্মক বিদ্যুৎ সংযুক্ত বরফশিলাগুলি (চিত্র: ১ক)।

স্থাণু বিদ্যুৎকণার একটি ধর্ম হল, এর প্রভাবে কাছাকাছি অন্য বস্তুর উপর বিপরীতধর্মী বিদ্যুৎকণার আবির্ভাব হয়। এই ধর্ম অনুসারে বজ্রমেঘের নীচে জমে থাকা ঋণাত্মক বিদ্যুৎকণার প্রভাবে মাটির বুকে এগিয়ে থাকে ধনাত্মক

বলে না হয় মেনে নেওয়া গেল, কিন্তু কোথা থেকে এদের আবির্ভাব, কেনই বা ঋণাত্মক কণার অধিষ্ঠান মেঘের শীর্ষদেশে আর ঋণাত্মকের জন্য নির্দিষ্ট হল পাদদেশ? গবেষকেরা এ নিয়ে অবশ্যই ভাবনাচিন্তা করছেন, এবং এখনও ভেবে চলেছেন। কৌতূহলী পাঠকের জন্য বর্তমানে প্রচলিত একটি ব্যাখ্যা সংক্ষেপে বলে নেওয়া যাক।

বজ্রগর্ভ মেঘ সৃষ্টি হওয়া তখনই সম্ভব, যখন তার উপরিভাগে তাপমাত্রা ০°৫-এর নীচে, যার ফলে জলের ফোঁটাগুলি সেখানে বরফে পরিণত হতে পারে। অনুকূল

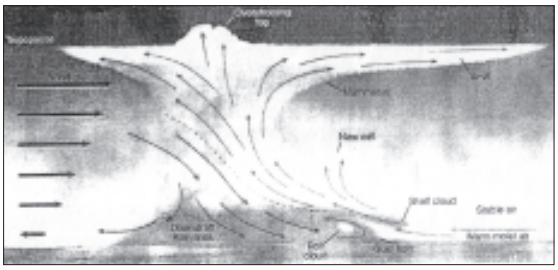

চিত্র ২

পরিস্থিতিতে বজ্রমেঘ ৪০,০০০ ফুট উচ্চতা ছাড়িয়ে যেতে পারে, যেখানে তাপমাত্রা নেমে যায় ৪০°সে.-এর নীচে। এই উচ্চতায় জলীয় বাষ্পকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব যদি মেঘে ঊর্ধ্বমুখী বায়ুর বেগ খুবই শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে। অবশ্য এর জন্য প্রয়োজন বায়ুমণ্ডলের অনুকূল পরিবেশ। এমন পরিবেশ পেলে তবেই বজ্রমেঘের সৃষ্টি হয়।

বজ্রমেঘের বৃদ্ধি সম্পূর্ণ হয়ে গেলে মেঘটির মাঝামাঝি উচ্চতা থেকে ঊর্ধ্বমুখী বায়ুর (আপ ড্রাফ্ট) পাশাপাশি একটা নিম্নমুখী বায়ুর (ডাউন ড্রাফ্ট) স্রোতও নামতে থাকে (চিত্র ২)। বরফের শিলাগুলি এই ঊর্ধ্ব ও নিম্নমুখী বায়ুর দোলায় চড়ে বার কয়েক ওঠানামা করে। এই ওঠানামার পথে বরফশিলাগুলি আরও জলীয়বাষ্পের সংস্পর্শে আসতে পারে, আর সেই সুযোগে আরো জলীয়বাষ্পকে ঘনীভূত করে শিলাখণ্ডটির আকার বাড়িয়ে দেয়। বরফে পরিণত হওয়ার সময় জলীয় বাষ্প ঘনীভবনের লীন তাপ (latent heat of condensation) শিলাখণ্ডটির তাপমাত্রা কিছুটা বাড়িয়ে দেয়। গবেষকদের মতে অপেক্ষাকৃত উষ্ণ বড় শিলাখণ্ডটি শীতল ক্ষুদ্র বরফ কণিকার সংস্পর্শে এলেই একটা বৈদ্যুতিক কাণ্ড ঘটে যায়। শিলাখণ্ডটি গ্রহণ করে ঋণাত্মক কণা আর বরফ কণিকাটিতে থেকে যায় ধনাত্মক কণা (চিত্র ৩)।

ঊর্ধ্বমুখী বায়ুর স্রোত ছোট হালকা বরফকণিকাকে নিয়ে যায় উপর দিকে, আর ভারী শিলাখণ্ডটির হয় নিম্নগতি। শিলাখণ্ড ও বরফকণিকার ক্রমাগত সংস্পর্শে বেড়ে ওঠে বিদ্যুৎকণার ভাণ্ডার, আর ঊর্ধ্ব ও নিম্নমুখী বায়ুর স্রোত মুহূর্তে তাদের মধ্যে ঘটায় বিচ্ছেদ। এই তত্ত্ব নিয়ে বিতর্ক এখনও আছে, তবে সেটা বিজ্ঞানীদের চিন্তার বিষয়। আমরা সাধারণ মানুষ চিন্তিত বজ্রপাতের বিপদ নিয়ে। সেই আলোচনাতেই আবার ফিরে আসা যাক।

বজ্রাঘাতের পরিণাম কতটা মারাত্মক হতে পারে তার একটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে বজ্রপাতের সময় বিপরীতধর্মী বিদ্যুৎকণার মধ্যে আকর্ষণের শক্তি ও বিদ্যুৎপ্রবাহের পরিমাণের বহর থেকে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, বায়ুর মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ সৃষ্টি করতে হলে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক কণার মধ্যে প্রতি মিটার দূরত্বের জন্য দরকার মোটামুটি ৩০,০০,০০০ ভোল্ট। আমরা বাড়িতে যে বিদ্যুৎ ব্যবহার করি তার শক্তি মাত্র ২২০ ভোল্ট, ভারী যন্ত্রপাতির জন্য দরকার হয় ৪৪০ ভোল্টের। বায়ুর প্রতিরোধ শক্তি একবার ভাঙতে পারলে যে বিদ্যুৎপ্রবাহের সৃষ্টি হয় তার পরিমাণ ১,০০,০০০ অ্যাম্পিয়ারের আশেপাশে। সাধারণ একটা বাড়ির জন্য বিদ্যুৎপ্রবাহের পরিমাণ ৫ অ্যাম্পিয়ারের বেশি নয়। যাঁরা এয়ার কন্ডিশনার ব্যবহার করেন, তাঁদের প্রয়োজন ১৫ অ্যাম্পিয়ার।

আমাদের উৎপাদিত বিদ্যুৎশক্তির তুলনায় একটি বজ্রের এই বিপুল পরিমাণ শক্তি আমাদের বিস্ময়ে হতবাক করে বটে কিন্তু বজ্রের আয়ু কয়েক সেকেন্ড মাত্র। যত স্বল্পায়ুই হোক না কেন বিদ্যুতের এই ঝলক যে তাপ সৃষ্টি করে সেটা আমাদের কল্পনাতীত। তাপমাত্রা পৌঁছে যায় প্রায় ৩০,০০০° সেঃ। যে সূর্য গোটা সৌরজগৎকে তাপ ও শক্তি জোগায় তার উপরিভাগের তাপমাত্রার প্রায় ৫ গুণ। সহজেই অনুমান করা যায়, এই বিপুল পরিমাণ তাপ সংশ্লিষ্ট বায়ুকে কতটা ভয়ানক উত্তপ্ত ও প্রসারিত করে দেবে। এই প্রসারিত বায়ুর চাপ আশপাশের বায়ুর ওপর যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তার ফলে এই উত্তপ্ত বায়ু সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কুচিত হয়ে যায়। এই প্রসারণ ও সঙ্কোচনের লড়াই কিছুক্ষণ ধরে চলতেই থাকে,

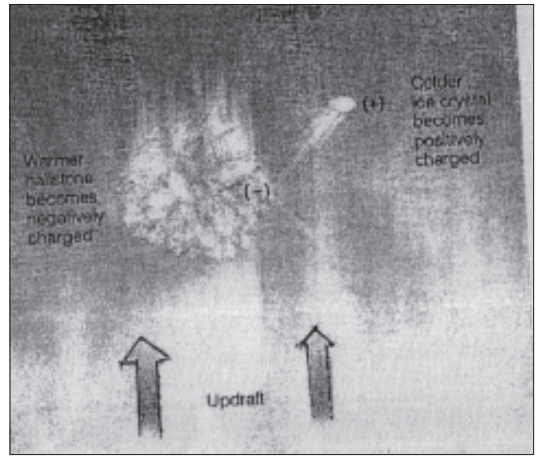

চিত্র ৩

যার ফলে সৃষ্টি হয় বায়ুর কম্পন। বায়ুর এই কম্পনই আমাদের কানে আসে বাজের ডাক রূপে। (এখানে মনে করিয়ে দেওয়া ভাল যে, সূর্য যুগ যুগ ধরে শক্তির বিকিরণ করে চলেছে, আর বজ্রের আয়ু কয়েক সেকেন্ড মাত্র। মোট শক্তির বিচারে বজ্রের শক্তি সূর্যের তুলনায় অতি তুচ্ছ।)

বাজ ক্ষণস্থায়ী হলেও বাজের সৃষ্ট কর্ণবিদারক যে ডাক আমাদের বুককে কাঁপিয়ে দেয় সেটা বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলতেই থাকে। মেঘের এই ডাক যত তীব্রই হোক না কেন এটা প্রাণঘাতী নয়। কিন্তু বজ্রের তীক্ষ্ণ জিহ্বার একটু ছোঁয়া আমাদের প্রাণ হরণ করতে পারে, অন্তত জ্ঞান তো হরণ করবেই। যদি আপনি মেঘের ডাক সজ্ঞানে শুনতে পান, তবে জানলেন, আপনি বেঁচে গেলেন, বাজ আপনাকে স্পর্শ করতে পারে নি। কারণ আলো ছোটে সেকেন্ডে প্রায় ৩০,০০,০০,০০০ মিটার, আর শব্দ সেকেন্ডে প্রায় ৩৩০ মিটার মাত্র। তাই বাজের ঝলক বলা যেতে পারে, আপনি সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাচ্ছেন, কিন্তু তার ডাক আপনার কানে পৌঁছবে কয়েক সেকেন্ড পরে। এই সময়ের ব্যবধান যদি ৩ সেকেন্ড হয় তবে বুঝতে হবে বাজ ও আপনার মধ্যে দূরত্ব প্রায় ১ কিলোমিটার।

বিদ্যুতের ঝলক অধিকাংশ সময়েই আমরা অনেক দূর থেকে দেখে থাকি। তাই বলে এর ব্যতিক্রম কি হয় না? বাজ যদি গুম-গুম করে ভীমগর্জন করে বা কড়্‌কড়্‌ করে কর্কশ- চেরা গলায় হাঁক ছাড়ে তবে জানবেন আপনি বজ্রের নাগালের মধ্যে। এমনটি হলে বজ্রাহত হওয়ার খুবই সম্ভাবনা। প্রয়োজন নিরাপদ আশ্রয়ের। বজ্রাঘাতের সম্ভাবনা কিছু কিছু উপায়ে কমানো যেতে পারে। উপায়গুলি কয়েকটি নীচে দেওয়া হল।

১) যদি কাছাকাছি ভারী বজ্রপাত হতে থাকে তবে বাড়ির বাইরে যাবেন না। সেই সময় রাস্তায় বা মাঠে থাকলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কোনো বাড়ির ভেতরে আশ্রয় খুঁজে নিন। ২) মোটরযানে যেতে যেতে যদি পথে এমন পরিস্থিতিতে পড়েন তবে গাড়ির বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করবেন না। গাড়ির ভেতরে থাকাই নিরাপদ, কারণ বাড়ি বা গাড়ির ওপর বজ্রপাত হলে বিদ্যুৎপ্রবাহ বাড়ির দেওয়াল ও গাড়ির ধাতব আবরণের গা বেয়ে মাটিতে প্রবেশ করবে, কুপরিবাহী বায়ু ভেদ করে ভেতরে কাউকে স্পর্শ করতে পারবে না। ৩) খোলা জায়গা থেকে আশ্রয়ের দিকে যাওয়ার সময় মাথা যতটা সম্ভব নীচু করে হাঁটবেন, অর্থাৎ মেঘ থেকে আপনার দূরত্ব কিছুটা বাড়িয়ে নেবেন। তবে মাটিতে শুয়ে পড়বেন না কারণ বাজ মাটিতে কোথাও আঘাত করলে সেটা মাটির ভেতর দিয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। বরং গোড়ালি বা পায়ের আঙুলের ওপর ভর করে তাড়াতাড়ি হেঁটে যাবেন, মাটির সঙ্গে স্পর্শ যতটা সম্ভব বাঁচিয়ে। ৪) কোনো বড় গাছের নীচে আশ্রয় নেবেন না কারণ উঁচু জায়গায় অর্থাৎ মেঘের সবচেয়ে কাছে যাকে পাবে বাজ তাকেই আঘাত করবে। ৫) বজ্রপাত শুরু হওয়ার কিছু আগে থেকে তার লক্ষণ টের পেলে নিরাপদ আশ্রয় খোঁজার একটু বেশি সময় পাওয়া যায়। এরকম কিছু লক্ষণ হল (ক) চুলগুলো উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে পড়া, (খ) শরীরে সূঁচ ফোটার মতো অনুভূতি (tingling or prickling) হওয়া। এমন হলে বুঝতে হবে যে বাতাসে বিদ্যুৎকণাগুলো জমতে শুরু করেছে। বিদ্যুৎকণার পরিমাণ খুব বেশি হয়ে গেলে বজ্রপাতের সম্ভাবনা। তার আগেই নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে নেওয়া দরকার। ৬) কোনো বাড়ির ওপর বজ্রপাত হলে ভেতরে থাকা বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির ক্ষতি হতে পারে। সেগুলি রক্ষা করার জন্য উঁচু বাড়িতে ছাদের ওপর একটি বিদ্যুতের সুপরিবাহী ধাতব শলাকা (lightning rod) লাগান হয়ে থাকে। এর সঙ্গে একটি মোটা তামার পাত যুক্ত করে সেটা মাটির অনেক গভীরে পুঁতে রাখা হয়। মেঘের ঋণাত্মক কণার প্রভাবে নীচে ধনাত্মক কণাগুলো এই শলাকার ছুঁচলো শীর্ষভাগে বেশি করে জমতে থাকে। তাই বজ্র এই শলাকাটিকেই আঘাত করে ও সুপরিবাহী তামার পাতটি ধরে মাটির গভীরে প্রবেশ করে, বাড়িটি রক্ষা পায় (এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে এই পদ্ধতি বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন-এরই একটি উদ্ভাবন।) কাছাকাছি বজ্রপাত শুরু হলে কর্ডলেস টেলিফোন, শাওয়ার বাথ ইত্যাদি ব্যবহার না করাই ভাল।

প্রকৃতির নিয়মে বজ্রপাত হবেই। কিন্তু জীবনযাত্রা থেমে থাকবে না। প্রকৃতির সঙ্গে আপস করে দুর্যোগ থেকে বাঁচার উপায় উদ্ভাবন ও সেগুলির প্রয়োগে নিজেদের সুরক্ষিত রাখাতেই আছে সমস্যার সমাধান। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বজ্রাঘাতের শিকার হয়ে থাকে মাঠে-ঘাটে খেটে খাওয়া দরিদ্র হতভাগা মানুষেরা। প্রবন্ধটি রচনা তবেই সার্থক মনে করা যেতে পারে যদি সেটা এই হতভাগ্যদের মাত্র একটি প্রাণকেও বজ্রাঘাতে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারে।

উমা

সনাতনের তৃতীয় কাহিনী: জ্যোতিষ

জয়দেব গুপ্ত

যাহারা জ্যোতিষে বিশ্বাস করে, তাহারা আসলে মনের রুগী। তাহাদের উচিত অবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা, ভালো খাদ্য খাওয়া ও বিশ্রাম করা— স্বামী বিবেকানন্দ

গ্রহদের সভা বসেছে। যদিও সূর্য নক্ষত্র, তবুও যেহেতু জ্যোতিষ শাস্ত্রে রবিকে গ্রহ বলা হয়েছে এবং যেহেতু সূর্য সব গ্রহের চালিকাশক্তি, তাই সূর্য সভাপতি রূপে এই সভায় উপস্থিত। উপপত্নী যেমন একরকম পত্নী, উপগ্রহও তেমন গ্রহ, তাই চন্দ্রও এই সভায় সদস্য হিসাবে রয়েছেন। সভামঞ্চে মধ্যিখানে সূর্য বসে আছেন। তাঁর দুপাশে এদিকে ছয়, ওদিকে ছয় আসন। মোট বারোটি আসনে উপবিষ্ট যথাক্রমে বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন, প্লুটো, চন্দ্র এবং সেরেস। এখানে বলে রাখা দরকার, সেরেস গ্রহাণুপুঞ্জের সর্ববৃহৎ সদস্য, তাই গ্রহাণুপুঞ্জের মুখপাত্র রূপে তিনি সভামঞ্চে রয়েছেন। পৃথিবীকে নিয়েই আলোচনা, তাই পৃথিবীকে ডাকা হয় নি। এবং রাহুর যেহেতু শরীর নেই, তাই তাঁর আসন জোটে নি। তাঁর মুণ্ডুটা টেবিলে ফুলদানির পাশে রাখা রয়েছে। তাঁর চোখ পিটপিট করা দেখে বোঝা যাচ্ছে তিনি প্রাণময়। অবশিষ্ট একটি খালি চেয়ারে কেতুর দোভাষী বসে আছেন। আসলে কেতু যেহেতু কথা বলতে পারেন না, তাই বধিরদের ভাষায় হাত পা আঙুল নেড়ে যা বলবেন, দোভাষী সেটা মৌখিক ভাষায় প্রকাশ করে দেবেন। শ্রোতাদের আসন ভরিয়ে রেখেছে গ্রহাণুপুঞ্জের দল।

সভার শুরুতেই সূর্য প্রারম্ভিক ভাষণে আজকের সভার বিষয় ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করলেন— 'পৃথিবীর মানুষ আমাদের নামে যা ইচ্ছে তাই প্রচার করে চলেছে। আমরা নাকি তাদের ভূত ভবিষ্যৎ সব পরিচালনা করছি। প্রিয় বন্ধুগণ, সবাই জানেন আমরা not in seven, not in five। আমরা যে যার নিজ নিজ কক্ষপথে ঘুরে বেড়াই। কারও খাইও না, পরিও না। অথচ, তবু আমাদের নামে জ্যোতিষ না কি একটা উদ্ভট শাস্ত্র রচনা করে মানুষের দুঃখ-সুখের সব দোষ আমাদের ওপর চাপাচ্ছে। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ করছি।'

ইউরেনাস হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'সভাপতি মশাইয়ের অনুমতি নিয়ে আমি বলতে চাই, মানুষ জ্যোতিষশাস্ত্রে আমাদের, মানে ইউরেনাস আর নেপচুন প্লুটোর কোনো স্থান নির্ণয় করে নি। আমরা তো 'ন ঘর কা না ঘাট কা!'

বয়োজ্যেষ্ঠ বৃহস্পতি একটু গম্ভীর প্রকৃতির। বললেন, 'আর্যভট্ট বা বরাহমিহিরের আমলে মানুষ তোমাদের দেখতে পায় নি, তাই তোমরা নেই।'

নেপচুন দুঃখিত স্বরে বলল, 'কিন্তু পরে তো মানুষ আমাদের দেখতে পেয়েছে। তাহলে গ্রহতালিকায় আমাদের নাম তো ঢোকানো যেত।'

বৃহস্পতি জানালেন, 'গ্রহতালিকায় তোমাদের নাম আছে। বর্তমান জ্যোতির্বিজ্ঞানে (অ্যাস্ট্রোনমি) তোমরা আছো। কিন্তু জ্যোতিষশাস্ত্র (অ্যাস্ট্রোলজি) বরাহমিহিরের কালেই আটকে আছে। তাছাড়া তোমাদের নাম ঢোকাতে গেলে আধুনিক বিজ্ঞানকে মেনে নিতে হবে, তাই দু হাজার বছরের পুরনো জ্যোতিষে তোমরা বাদ। তবে দুঃখ করো না; জ্যোতিষে তোমরা নেই বলে তো তোমাদের ঘাড়ে কোনো দোষও পড়ে নি!'

ইউরেনাস বলল, 'দোষ পড়ে নি সেটা হয়ত ভাল, কিন্তু ওই পুঁচকে চাঁদের তুলনায় আমরা অনেক বড়, তবু আমাদের কেউ পাত্তা দেবে না কেন?'

সূর্য থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'অকারণ নিজেদের মধ্যে ঝামেলা করে কী লাভ! তোমাদের নাম নেই কেন, সেটা তো আমাদের কারো দোষ নয়। জ্যোতিষশাস্ত্র মানুষ বানিয়েছে, তারাই উত্তর

দিতে পারবে। এখন আসল প্রসঙ্গে ফিরে আসি। মানুষ জ্যোতিষের নামে আমাদের নানান বদনাম করছে, যেমন 'রাহুর দশা'— কোনো লোক খুব খারাপ অবস্থায় পড়লে বলা হয় তার রাহুর দশা চলছে। রাহু কিছু কলকাঠি নেড়ে তার ভাগ্যটা খারাপ করে দিয়েছে। রাহু চেঁচিয়ে উঠল 'বাজে কথা। আমি কারুর কিছু করি নি!'

সূর্য রাহুকে থামালেন, বললেন, 'জানি। তোমার কোনো দোষ নেই। এটা মানুষের বানানো। এরকম আরো আছে। যেমন কারুর বর্তমানে কোনো সমস্যা থাকলে বলা হয়, 'শনির দৃষ্টি পড়েছে'।'

শনি অবাক, 'আমি! আমার দৃষ্টি! কার ওপর?'

—কয়েকজন ব্যক্তির ওপর।

—বিশ্বাস করুন, আমি এত দূরে থাকি, পৃথিবীটাকেই ভাল করে দেখতেও পাই না, তো পৃথিবীর কয়েকজন মানুষের ওপর দৃষ্টি দেব কী করে!

—জানি। এটাও একটা বানানো গল্প।

—তাহলে তো এর প্রতিবাদ হওয়া উচিত।

—সেই জন্যেই তো এই সভা ডাকা হয়েছে। এই সভায় আমরা আলোচনা করব, এর প্রতিবাদে কী করা উচিত। এখানে সবাই এসেছেন এবং সঙ্গে বিদ্বান গুরু বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্যও আছেন। আপনারা সবাই আলোচনা করে ঠিক করুন কীভাবে কী করা যায়।

শনি রেগে ছিলেন, বললেন, 'অকারণ আমাদের নামে দোষ? পৃথিবী থেকে কয়েকটা জ্যোতিষীকেও ডেকে আনুন, মজা দেখাচ্ছি।'

সূর্য বললেন, 'মজা পরে দেখাবেন। আগে তো জানতে হবে আমাদের নামে কী কী বদনাম তারা করেছে। আমি একটা তালিকা বানিয়েছি। এতে আছে, জ্যোতিষীরা আমাদের নামে কী কী ভুল তথ্য দিচ্ছে। তালিকাটি গুরু বৃহস্পতিকে দিচ্ছি, তিনি সবটা পড়ে সবাইকে শোনান, তারপর সিদ্ধান্ত নিন কী করা উচিত।'

সূর্য বৃহস্পতিকে তালিকাটি দিলেন। বৃহস্পতি উচ্চস্বরে তা সবাইকে পড়ে শোনালেন। শুনেই সব গ্রহ মিলে হইচই শুরু করল, 'বাজে কথা, মিথ্যে কথা ...' বৃহস্পতি সবাইকে শান্ত হতে বললেন, তারপর শুক্রাচার্যের সঙ্গে কিছু আলোচনা করলেন এবং আলোচনার শেষে সবাইকে বললেন, 'আমাদের মত, একদল জ্যোতিষীকে আনলে, তারা সবাই মিলে চেঁচামেচি করবে। তাই আমরা মত দিচ্ছি, একজন নামকরা জ্যোতিষীকে পৃথিবী থেকে এই সভায় ধরে আনা হোক।'

সবাই সমস্বরে সায় দিলেন।

তখন বৃহস্পতি একজন স্বেচ্ছাসেবক রক্ষীকে আদেশ দিলেন পৃথিবী থেকে একজন নামকরা বয়স্ক জ্যোতিষীকে ধরে আনতে। রক্ষী আলোর গতিতে পৃথিবীতে পৌঁছে একজন বয়োজ্যেষ্ঠ পাকা জ্যোতিষীকে নিয়ে কয়েক পলের মধ্যে সভায় হাজির করলেন।

জ্যোতিষী সভায় উপস্থিত হয়েই প্রথমে সবাইকে দেখলেন। মুখে সামান্য হাসির রেখা দেখা দিল। বললেন, 'কয়েকজন ছাড়া বেশিরভাগই ত আমার চেনা। কেমন আছেন সব? আপনাদের কোনো ভাগ্যজনিত সমস্যা হয়েছে? বলুন গণনা করে বলে দিচ্ছি, প্রতিবিধানও বলে দেব।' বলে জ্যোতিষী আসন গ্রহণ করলেন।

সূর্য ধমক দিলেন, 'আপনাকে বসার অনুমতি কে দিয়েছে? দাঁড়ান, দাঁড়ান।'

জ্যোতিষী ঘাবড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন। বললেন, 'উপবেশন না করলে তো গণনা হবে না।'

শুক্র বললেন, 'গণনার দরকার নেই। এইখানে এই চৌকো বাক্সটা রয়েছে, ওটা কাঠগড়া, ওটার মধ্যে গিয়ে দাঁড়ান।'

জ্যোতিষী ফিক করে হাসলেন, বললেন, 'এই ইয়ার্কি করবেন ন,া মাইরি। কাঠগড়ায় দাঁড়াব কেন? আমি কি আসামি?'

শনি রেগে ছিলেন, বললেন, 'আসামি না ফাঁসামি সেটা পরে বুঝবেন, এখন ওখানে গিয়ে দাঁড়ান।'

(ফাঁসির আসামি বলতে গিয়ে জড়িয়ে ফাঁসামি বললেন)

জ্যোতিষাচার্য শ্রীশ্রী ভয়ঙ্কর শাস্ত্রী মহাশয় কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর গলায় একটি মোটা সোনার হার। হাতে একটি স্বর্ণময় বিলিতি ঘড়ি। যদিও পৃথিবীর সময় এখানে প্রযোজ্য নয় বলে ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে।

সূর্য বললেন, 'শুনানি শুরু হোক।'

বৃহস্পতি উঠে দাঁড়ালেন, 'আপনার নাম, ঠিকানা, বয়স, পেশা এবং সম্পত্তির পরিমাণ বলুন।'

জ্যোতিষী— নাম জ্যোতিষাচার্য শ্রীশ্রী ভয়ঙ্কর শাস্ত্রী। ঠিকানা C/O রত্নালয়, একটি রত্ন জুয়েলারির দোকান, ৮৪১ নং, কলকাতা মেন রোড, কলকাতা। বয়স ৬২ বছর। পেশা - জ্যোতিষ শাস্ত্র মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ এবং ব্যক্তিগত স্বাধীন জ্যোতিষ ব্যবসা, থুড়ি, ব্যবসা নয়, গণনা এবং প্রতিবিধান দান। আর সম্পত্তির কথা কী বলব, খুবই গরিব ছিলাম ছোটবেলায়। পিতা সৎ ব্রাহ্মণ ছিলেন, সৎ হলেই গরিব হয়,

এ তো সবাই জানেন। তবে আমি নিজের চেষ্টায়, নিজের অধ্যাবসায়ে পদার্থ বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাবার পর এই জ্যোতিষচর্চা শুরু করি এবং এখন আমার প্রতিপত্তিতে অনেক জ্যোতিষী আমাকে ঈর্ষা করে।

বৃহস্পতি— আপনার সম্পত্তির পরিমাণ বলুন।

জ্যোতিষী— বলা যাবে না স্যার। আয়কর উকিলের সঙ্গে পরামর্শ না করে বলা যাবে না। আসলে কতটা দেখানো আছে, আমি ঠিক জানি না।

বৃহস্পতি— আপনাদের নামে কয়েকজন গ্রহের কিছু অভিযোগ আছে।

শনি তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বললেন, 'আপনারা নাকি প্রচার করেছেন যে, কিছু মানুষের ওপর আমার দৃষ্টি পড়ার ফলে তাদের অবস্থা খারাপ হয়!

জ্যোতিষী— হ্যাঁ, তাই তো। আপনার দৃষ্টি মানে তো সব্বোনাশ।

শনি এবার আরো রেগে গেলেন, 'বাজে কথা বলবেন না। আমার দৃষ্টি? আমি অত দূর থেকে পৃথিবীটাকেই ভালো করে দেখতে পাই না, মানুষ দেখা তো দূরস্থ।

জ্যোতিষী— ওসব বললে তো হবে না। গণনায় যা বেরোবে তাই— এর ব্যাত্যয় নেই।

শনি— আপনার গণনার নিকুচি করেছে। যত সব আষাঢ়ে গল্প। মিথ্যে কথা। গণনা না কচু। সব বুজরুকি।

সূর্য শনিকে শান্ত হতে বললেন। বৃহস্পতিকে বললেন, 'আপনি বলুন।'

বৃহস্পতি— আপনারা বলেন গ্রহদের বক্র গতি, অতিচার গতি আছে— এগুলো কী?

জ্যোতিষী— বক্র গতি মানে, গ্রহরা কখনও পিছিয়ে পড়ে বা উল্টো দিকে চলতে আরম্ভ করে। আর অতিচার গতি মানে গ্রহরা কখনও কখনও হঠাৎ গতি বাড়িয়ে দ্রুত চলতে থাকে।

বৃহস্পতি— কে বলেছে এসব? আমাদের গতি কেপলারের সূত্র মেনে কখনও সামান্য বাড়ে কমে বটে, কিন্তু উল্টো দিকে চলা! পুরো সোলার সিস্টেমটাই ওলট-পালট হয়ে যেত তাহলে। পৃথিবীও রক্ষা পেত না। আপনারাও সবাই অক্কা পেতেন। কে বলেছে এসব?

জ্যোতিষী— দেখুন, জ্যোতিষশাস্ত্র ব্রহ্মা রচিত। মানুষের ভূত ভবিষ্যৎ তিনি ছাড়া কে জানবেন! আর মহামুনি ভৃগু কোটি কোটি বছর আগে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের অতীতের, বর্তমানের, ভবিষ্যতে যাঁরা জন্মাবেন তাঁদের, প্রত্যেকের ললাটলিখন লিখে দিয়ে গেছেন।

বৃহস্পতি— কোথায় সেই লেখা?

জ্যোতিষী— শুনেছি বারাণসীর কোনো এক গোপন স্থানে রক্ষিত আছে।

বৃহস্পতি— কত বছর আগে লিখেছেন বললেন, কোটি কোটি বছর আগে? কী ভাষায় লিখলেন?

জ্যোতিষী— কেন? সংস্কৃত ভাষায়।

বৃহস্পতি— সংস্কৃত ভাষা কি কোটি কোটি বছরের পুরনো? বর্তমান মানুষ হোমো ইরেক্টাস জন্মেছে দশ লক্ষ বছর আগে। আর ভৃগু লিখলেন কোটি কোটি বছর আগে? ভৃগু কি মানুষ ছিলেন, নাকি ডাইনোসর! দ্বিতীয় প্রশ্ন, ভৃগু কিসের ওপর লিখেছিলেন? কাগজ তখনও আবিষ্কৃত হয় নি। ভূর্জপত্রে লিখলে, তা এতদিনে ধুলো হয়ে যাবার কথা। তিনি কি পাথরে খোদাই করে লিখে গেছেন? তাহলে তো এত লোকের ভাগ্য লিখতে একটা হিমালয় পর্বত লাগবে। সেই পর্বত বারাণসীর গোপন স্থানে আছে বলছেন?

জ্যোতিষী— এই, আপনি মাইরি সব গুলিয়ে দিচ্ছেন। যাঁরা গণনা করাতে আসেন, তাঁরা এ সব বেয়াড়া প্রশ্ন করেন না।

বৃহস্পতি— আমরা করি।

জ্যোতিষী— এই স্যার, মানে বেসপতিদা, আমাকে এরকম ফাঁসাচ্ছেন কেন?

শুক্র— আর ওইটা জিজ্ঞেস করুন, গ্রহদের শত্রুতা।

বৃহস্পতি— ঠিক, ভাল মনে করিয়েছেন। এই যে জ্যোতিষীমশাই, আপনারা গ্রহদের মধ্যে শত্রুতা বানিয়েছেন।

জ্যোতিষী— মানে?

বৃহস্পতি— যেমন ধরুন আপনারা বলেছেন, চন্দ্র হচ্ছে বৃহস্পতি, শুক্র, শনি আর রাহুর শত্রু।

চন্দ্র এটা শুনে উঠে দাঁড়াল। বিরক্তি প্রকাশ করে বলল, 'একি! এটা কী! আমি ওদের শত্রু? বিশ্বাস করুন, আমি কারুর শত্রুতা করি নি।

জ্যোতিষী— দাবি করলে তো হবে না। জ্যোতিষে লেখা আছে।

চন্দ্র— বাজে কথা লেখা আছে। মিথ্যে কথা। সবাইকে জিজ্ঞেস করুন, আমি কারও শত্রুতা করেছি কিনা।

সূর্য— ও হে চন্দ্র, তোমার বলার দরকার নেই। কাউকে জিজ্ঞেস করারও দরকার নেই। আমরা জানি ওসব বাজে কথা।

বৃহস্পতি আবার জ্যোতিষীর দিকে ফিরলেন, বললেন, 'আরো আছে আপনারা বলেছেন, বুধ ও শুক্র আমার শত্রু। শুক্র ও

শনি রবির শত্রু। রবি, চন্দ্র ও মঙ্গল, এরা শুক্র আর রাহুর শত্রু। কি, ঠিক বলছি তো?

জ্যোতিষী— জ্যোতিষে লেখা আছে তো আমি কী করব! আমি তো লিখি নি!

বৃহস্পতি— কিন্তু আপনারা এগুলো প্রচার করেন তো।

জ্যোতিষী— আমাদের পেশাটাই তো ওইরকম।

বৃহস্পতি— কে লিখেছে এ সব?

জ্যোতিষী— ওই যে বললাম, জ্যোতিষশাস্ত্র ব্রহ্মার সৃষ্টি।

বৃহস্পতি— ওই এক ব্যাখ্যা। ধর্মে ব্রহ্মবাদ, জ্যোতিষে ব্রহ্মা— এ তো দেখছি ব্রহ্মার নাম করে যত রকম বদমাইসি করেন আপনারা।

জ্যোতিষী— দেখুন, এ সব তো ধর্মে আছে।

বৃহস্পতি— জানি, লোক ঠকানো ধর্মেও আছে, জ্যোতিষেও আছে।

জ্যোতিষী— দেখুন বেসপতিদা, ধর্মে আছে, মানতে তো হবে।

বৃহস্পতি— এসব ধর্মে আছে? ধর্ম আর জ্যোতিষ সব মিশিয়েছেন, তাই তো?

জ্যোতিষী— হ্যাঁ, মানে না, মানে তাই—

বৃহস্পতি— তা এই ধর্মের ষাঁড়টি কারা কারা?

জ্যোতিষী— ওই তো সব আছে, ব্রাহ্মণ, পুরোহিত, শঙ্করাচার্য...

সূর্য বৃহস্পতির দিকে তাকালেন, বললেন, 'তা ওই একটা ধর্মের ষাঁড়কে আনান না এখানে ধর্ম আর জ্যোতিষের যুগ্ম খেলাটা দেখি।

শুক্র প্রহরীকে আদেশ দিলেন পৃথিবী থেকে একজন ধর্মবাহককে ধরে আনতে। ঠিক আগের মতোই কয়েক পলের মধ্যে প্রহরী একজন গেরুয়াধারীকে নিয়ে এলেন। তাঁর একমুখ দাড়ি, মাথায় জটাও গজিয়েছে এবং পায়ে পাদুকা মানে খড়ম।

সূর্য— আপনি কে?

গেরুয়াধারী— আমি? আমি কেউ না। কেউই কেউ না।

সূর্য শুক্রাচার্যকে বললেন, 'বৃহস্পতি অনেকক্ষণ ধরে সওয়াল করেছেন। একে আপনি প্রশ্ন করুন।

শুক্র গেরুয়াধারীর দিকে এগিয়ে গেলেন। এবং গেরুয়াধারী সঙ্গে সঙ্গে পা এগিয়ে দিয়ে আশীর্বাদের ভঙ্গি করলেন। শুক্র অবাক হয়ে বললেন, 'এটা কী?'

গেরুয়াধারী— সাষ্টাঙ্গে প্রণতি। শঙ্করাচার্য দর্শনের এটাই নিয়ম।

শুক্র— (সূর্যকে) দেখুন দিবাকরদা, এই মনুষ্য আমাকে বলছে ওকে প্রণাম করতে। কী যেন নাম বলল, শঙ্করাচার্য?

রবি— আপনি এখন ভারতবর্ষের শঙ্করাচার্য?

শঙ্করাচার্য— ভারতবর্ষের মানে?

রবি— ভারতবর্ষে পর্যায়ক্রমে একজন করে শঙ্করাচার্য হয় তো। একজন মরে গেলে আর একজন। তিব্বতে যেমন লামা।

শঙ্করাচার্য— আপনি তো কিছুই খবর রাখেন না। প্রথম শঙ্করাচার্য তাঁর সময়ে ভারতে একমাত্র শঙ্করাচার্য ছিলেন। ক্রমে তো সংখ্যা বেড়েছে। যেমন পুরীর শঙ্করাচার্য, কাঞ্চীর শঙ্করাচার্য, হরিদ্বারের শঙ্করাচার্য ...

শুক্র— তো, আপনি কোথাকার?

শঙ্করাচার্য— আমি মেদিনীপুরের শঙ্করাচার্য।

শুক্র— মেদিনীপুরের?

শঙ্করাচার্য— হ্যাঁ, এখন জনসংখ্যা বেড়ে গেছে তো। এখন ওই দু-তিনজন শঙ্করাচার্যকে দিয়ে কুলোচ্ছে না। তাই আমরা এখন ঠিক করেছি জেলাভিত্তিক শঙ্করাচার্য থাকা দরকার।

শুক্র— কে ঠিক করে এগুলো?

শঙ্করাচার্য— আমরাই ঠিক করি।

শুক্র— আমরা মানে কে? স্বঘোষিত?

শঙ্করাচার্য— ওই রকমই।

শুক্র— যা হোক, আসল কথায় আসি। এই জ্যোতিষবাবু বলছেন যে ধর্মই নাকি জ্যোতিষের ব্যাপার-স্যাপারগুলো ঠিক করে দেয়।

শঙ্করাচার্য— ধর্ম কে? জ্যোতিষই বা কী? আসলে সবই তো মায়া।

শুক্র— মায়া আবার কে?

শঙ্করাচার্য— মায়া— মায়া— ইংরিজিতে যাকে বলে ভ্যানিটি। আসলে কি জানেন, আপনি, আমি, পৃথিবী, পৃথিবীর মানুষ, ঘটনাপ্রবাহ, এগুলো কিছুই নেই—সবই মায়া। মনে হচ্ছে আছে, আসলে নেই।

শুক্র— সেটা কী রকম? একটু ব্যাখ্যা করুন।

শঙ্করাচার্য— ব্যাখ্যা? সেও তো মায়া।

শুক্র— আর শাস্ত্র, ধর্ম, জ্যোতিষ—

শঙ্করাচার্য— সব, সব, সবই মায়া। এই যে আপনি আমায় প্রশ্ন করছেন— আপনার মনে হচ্ছে প্রশ্ন করছেন, আসলে করছেন না।

শুক্র— ও দিবাকরদা, এ কাকে ধরে আনল? এ তো মাথায় গণ্ডগোল। বলে সবই মায়া।

সূর্য— এই মশাই, যা জিজ্ঞেস করছে, সবেতেই মায়া মায়া করছেন কেন?

শঙ্করাচার্য— তাই তো। আপনিও মায়া, আমিও মায়া, ইনিও মায়া, উনিও মায়া, তিনিও—

সূর্য— ধুস। এই প্রহরী, কাকে ধরে আনলে? এর তো মাথায় ছিট। একে ফেরত দিয়ে এসো। একজন ব্রাহ্মণ পুরোহিত ধরে আনো। প্রহরী ফেরত দিতে গেল।

শুক্র— এই যে জ্যোতিষী মশাই।

জ্যোতিষী— বলুন। আবার জেরা করবেন নাকি?

শুক্র— করবই তো। আপনারা বলেছেন গ্রহদের নাকি অনেকরকম ভাব আছে, যেমন, শয়ন, উপবেশন, নিদ্রা, নৃত্যলিপ্সা, আগমন, ভোজন, গমন ইত্যাদি।

জ্যোতিষী— এই শুক্কুরদা, এই গমন বললেই কেমন বেশ্যালয়ে গমন মনে পড়ে যায়, বলেই জ্যোতিষী ফিক করে একটু হাসলেন।

শুক্র— চোপ, এখানে আপনাকে অসভ্য রসিকতা করার জন্যে আনা হয় নি।

জ্যোতিষী--- আমি আর কী বলব? এসবই তো জ্যোতিষশাস্ত্রের অন্তর্গত। আমরা প্রয়োগ করি মাত্র।

ইতিমধ্যে প্রহরী একজন পুরোহিতকে এনে হাজির হয়েছে। পুরোহিত মাটিতে আসন পেতে বসে পড়েছেন।

সূর্য— এই যে আপনি।

পুরোহিত— আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি গোবিন্দ পণ্ডিত। পেশা পৌরোহিত্য। সাকিন জলপাইগুড়ি, কলেজপাড়া, বয়স ৫৫, ফ্যামিলি আছে।

সূর্য— বাব্বাঃ। এ তো আবার জিজ্ঞেস করার আগেই সব বলে দেয়।

পুরোহিত— বলতে ভুলে গেছি, আমি কৌটিল্য চাণক্য বিষ্ণুগুপ্তর ৬৮তম বংশধর।

সূর্য— তো কী?

পুরোহিত— কী আবার? তথ্য সম্পূর্ণ হওয়া উচিত।

শুক্র— আচ্ছা পুরোহিত মশাই, আপনি আত্মা, জন্মান্তর, পুনর্জন্ম বিশ্বাস করেন তো?

পুরোহিত— সত্যকে কেই বা অস্বীকার করে?

শুক্র— আগের জন্মের পাপের ফল এই জন্মে বহন করতে হয়, এটা মানেন?

পুরোহিত— নিশ্চয়।

শুক্র— এবার বলুন, আগের জন্মে যে মানুষ পাপ করেছে, যেমন ব্রাহ্মণকে পদাঘাত, কিংবা নিষিদ্ধ দিনে অলাবু ভক্ষণ, এ জন্মে তার ফল ভোগ করতে হবে তো?

পুরোহিত— হবে। হতেই হবে। নট নড়ন-চড়ন নট কিচ্ছু। এ তো বিধাতা পুরুষের বিধান, খণ্ডাবে কে?

শুক্র— তবে যে জ্যোতিষীরা গণনা করে, গ্রহ রত্নের মাধ্যমে মানুষের কর্মভোগ কমিয়ে দেন, বিধাতা পুরুষ রাগ করেন না? জ্যোতিষীরা তো বিধাতার ওপর খোদকারি করেন; আপনার নট নড়ন-চড়ন নট কিচ্ছুর ফর্মুলা তো খাটল না!

পুরোহিত— এই রে! আপনি তো যুক্তির জালে ফাঁসিয়ে দিচ্ছেন। বিধাতাও ঠিক, জ্যোতিষও তো বিধাতার সৃষ্টি; এ তো শাঁখের করাতে ফাঁসলাম।

শুক্র— তার মানে স্বীকার করছেন যে, দুটো পরস্পরবিরোধী জিনিস। দুটোই ঠিক হতে পারে না।

পুরোহিত— দাঁড়ান, দাঁড়ান মনে পড়েছে। পরশুরাম মানে রাজশেখর বসু কোথায় যেন বলেছেন, ডিউ কর্মফলটা তার পরের জন্মে ক্যারিড ফরওয়ার্ড হয়ে যায়।

শুক্র—দূর মশাই, ওটা উনি ব্যঙ্গ করে বলেছেন।

পুরোহিত— ব্যঙ্গ করে বলেছেন? না, বিধাতাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করা উচিত নয়।

শুক্র— ধর্মের নামে, জ্যোতিষের নামে লোক ঠকানো কি উচিত? এই যে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে মৃতের আত্মাকে উৎসর্গ করা চাল ডাল কলা মূলো, সব আপনারা গৃহে নিয়ে যান এবং আত্মসাৎ করেন। মানে গোদা বাংলায় বললে, গলাধঃকরণ করেন, মানে গেলেন, তার বেলা? অনেক পুরোহিত তো শুনেছি চাল ডালগুলো আবার চেনা দোকানে resale করে দেন।

পুরোহিত— এই দাদা, আমি করি না, মাইরি বলছি। আগে করতাম, এখন আর করি না। এই যাঃ, মুখ ফস্কে বলে ফেললাম।

শুক্র— আপনাদের শালগ্রাম শিলা তো গোলাকার।

পুরোহিত— ঠিক বলেছেন।

শুক্র এক স্বেচ্ছাসেবকের কাছ থেকে গোলাকার পাথরের একটা বল চেয়ে নিলেন। পুরোহিতকে দিলেন, বললেন, ‘এটাকে শুইয়ে দিন।’ পুরোহিত বল মাটিতে রাখল। শুক্র বললেন, ‘শুইয়েছেন, এবার ওটাকে বসান।’

পুরোহিত— এই, কি বলছেন? গোলাকার বলের আবার শোয়া-বসা হয় নাকি?

শুক্র— তাহলে শালগ্রাম শিলার শোয়া-বসা হয় কী করে? গ্রহদেরও বা শয়ন, উপবেশন, নিদ্রা— এসব হয় কী করে?

পুরোহিত— কোথাও কোনো পুজো বা অন্নপ্রাশন, বিবাহ বা

শ্রাদ্ধ থাকলে বলুন, করে দিচ্ছি। মিছিমিছি নানা যুক্তি দিয়ে আমায় খোঁটা দিচ্ছেন কেন? যুক্তিফুক্তি সব বাজে জিনিস। আসল কথা হচ্ছে, বিশ্বাস আর ভক্তি। বিশ্বাস করুন, সব ঠিক মনে হবে। বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ ...

শুক্র— হ্যাঁ, এটা ঠিক বলেছেন। যুক্তি তর্ক সব বাদ। শুধু বিশ্বাস আর ভক্তি, না হলে ধর্ম আর জ্যোতিষ ব্যবসা চলবে কী করে?

পুরোহিত— মর্ত্যে যুক্তিবাদী বলে এক ধরনের মানুষ আছে, তাদের মানুষ না বলে হনুমান বলাই ভাল। আপনারাও মনে হচ্ছে তাদের মতো। এই প্রহরী চলো তো, আমাকে মর্ত্যে ফেরত দিয়ে এসো।

এই বলে, প্রহরীর হাত ধরে পুরোহিত প্রস্থান করলেন। সূর্য শুক্রকে কাছে ডেকে ফিসফিস করে বললেন, 'ওই জ্যোতিষীটাকে দিয়েই সত্য কবুল করাতে হবে, বুঝলেন? এমনি না হলে ভয় দেখান।'

শুক্র জ্যোতিষীর দিকে ফিরে বললেন, 'শুনুন জ্যোতিষী মশাই, সোজা কথা বলছি, আপনাদের আসল জায়গাটা পরিষ্কার করে বলুন। না হলে— সূর্যের গায়ের তাপমাত্রা জানেন? ৬০০০ ডিগ্রি। একবার আপনাকে ছুঁলেই আপনি পুরোটাই মুহূর্তে ছাই হয়ে যাবেন। কিংবা বৃহস্পতি বা শনি, এরা যদি একবার আপনাকে চেপে ধরে, তরল হাইড্রোজেনের ঠাণ্ডায় মুহূর্তে জমে বরফ হয়ে যাবেন, আপনার রক্ত জমাট বেঁধে যাবে।'

জ্যোতিষী— ও বাবা! তাহলে তো মরে যাব। কিন্তু পেশাগত গোপনীয়তা তো ফাঁস করা যাবে না।

শুক্র— যাবে না? বেশ, শনিদা, একবার এদিকে এসে এই জ্যোতিষীকে চেপে জড়িয়ে ধরুন তো।

জ্যোতিষী— এই, না না, বলছি, সব বলছি। কিন্তু একটা শর্ত, পৃথিবীর মানুষের কাছে এসব ফাঁস করা চলবে না।

শুক্র— চেষ্টা করব।

জ্যোতিষী— আসল কথাটা হচ্ছে কমন সেন্স, সাধারণ জ্ঞান। তার সঙ্গে একটু মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, সাইকোলজিক্যাল অ্যানালিসিস, বুঝলেন কিছু? খদ্দের যখন আমাদের কাছে আসেন, তখন নিশ্চয় কোনো সমস্যা আছে। আমরা সমস্যাটা জিজ্ঞেস করি না, শুধু বলি, হ্যাঁ বলুন, কী জানতে চান? ব্যস, সব গড়গড় করে বলতে আরম্ভ করে। প্রত্যেক মানুষের নিজের সম্বন্ধে বলার ইচ্ছে অতি প্রবল। এই সাইকোলজিটাকেই কাজে লাগাই। তারপর গণনা করার ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট প্রশ্নের মাধ্যমে সব জেনে নিই।

শুক্র— অনেক জ্যোতিষী তো শুনেছি কিছু না শুনেই, শুধু খদ্দেরকে দেখেই সব বলতে আরম্ভ করেন। সেটা?

জ্যোতিষী— এটাও কিছু আহামরি শক্ত নয়। যেমন— ১) আপনার সময়টা খারাপ যাচ্ছে। (ওই জন্যেই তো জ্যোতিষের কাছে আগমন, সুতরাং মিলে গেল।) ২) এত চিন্তা করবেন না। চিন্তা করলে সমস্যার সমাধান হয় না। একরতির একটা পোখরাজ পরুন, সব ঠিক হয়ে যাবে। (সাইকোলজি ২, সব মানুষই জেগে থাকলে কিছু কিছু চিন্তা করেই। মাথা কখনও খালি থাকে না। এবং যে মানুষ জ্যোতিষীর কাছে এসেছে, তার নিশ্চয় কিছু সমস্যা আছে, সুতরাং সেই সমস্যা নিয়ে সে তো চিন্তা করবেই। তা ছাড়া যে মানুষ জ্যোতিষীর কাছে এসেছে, সে তো বিশ্বাস করবে বলেই এসেছে।) ৩) আপনাকে অন্যরা বুঝতে পারছেন না। (প্রত্যেক মানুষের ধারণা, তাকে অন্যরা সম্পূর্ণভাবে বোঝে না।) ৪) তরুণ-তরুণী হলে মূলত চাকরি অথবা প্রেমজনিত সমস্যা হয়। সুতরাং বলা হবে, 'যা আশা করছ তা শিগগিরই পূরণ হবে। যা চাইছ, তা তোমার হবে।' (ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন) ৫) বয়স্ক মহিলা হলে সাধারণত দুটো সমস্যা হয়— একাকিত্ব অথবা পুত্রবধূর সঙ্গে অবনিবনা। সুতরাং নির্ভয়ে বলে দিন, 'অন্যরা খুব শিগগিরই আপনাকে বুঝতে পারবে, কাছে আসবে, আপন করে নেবে। একটা মুনস্টোন পরুন। ৬) যদি বয়স্ক পুরুষ হয়—

শুক্র— ব্যস ব্যস। বুঝে গেছি। আর উদাহরণ দিতে হবে না। মানুষের কমন সাইকোলজিগুলো ব্যবহার করুন, তাই তো?

জ্যোতিষী— এই ত এতক্ষণে বুদ্ধি খুলেছে। বুঝতে পারছেন।

শুক্র— তার সঙ্গে এটাও বুঝতে পারছি যে, মানুষের মনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বেশ কিছু মালকড়ি কামিয়ে নেন। এটা কি শিক্ষার অভাবের জন্য হয়?

জ্যোতিষী— সাধারণ মানুষ, অশিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত, মানুষ ছাড়াও অনেক শিক্ষিত (মানে ডিগ্রিধারী) মানুষও আমাদের কাছে আসেন। ভাব দেখান যেন অনেক কিছু জানেন; আসলে মুরগি হতে আসেন। এর মধ্যে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল, ব্যারিস্টার, উচ্চপদে চাকুরিজীবী সবাই আছেন। এমনকি, যদিও বিশেষ শিক্ষাদীক্ষা না থাকলেও চলে, এমন রাজনীতিবিদ, ফিল্মস্টার বা খেলোয়াড়রাও আসেন। মানুষ যদি সেধে বলির পাঁঠা হতে চায়, আমরা কী করব! সুযোগ বুঝে মালকড়ি খিঁচে নিই।

শুক্র— কিন্তু বাইচান্স যদি রত্ন ধারণ সত্ত্বেও কাজ না হয়

(না হবার সম্ভাবনা ত রয়েই গেল) তখন?

জ্যোতিষী— জ্যোতিষ অভ্রান্ত। মিললেও অভ্রান্ত, না মিললেও অভ্রান্ত। এতটাই যখন বলেছি, তখন এটাও বুঝিয়ে দিই। প্রথমত, যে ব্যাপারগুলো মিলে যায়, মানুষ সেগুলোই মনে রাখে। যেগুলো মেলে না, সেগুলো মানুষ ভুলে যায়। অথবা তা সত্ত্বেও কেউ চ্যালেঞ্জ করে, যখন চারটে সম্ভাবনা— ১) রত্ন ধারণ করেছে, ফল পেয়েছে। (জ্যোতিষ অভ্রান্ত) ২) রত্ন ধারণ করেছে, ফল পায় নি। (ঠিকই তো, রাহু এত প্রবল যে রত্নের কাজটা আটকে গেছে। আপনি এর সঙ্গে একটা পোখরাজ পরুন, তাহলে রাহুর প্রাবল্য কমবে। (জ্যোতিষ অভ্রান্ত) ৩) রত্ন ধারণ করে নি, ফল পেয়েছে। (হবেই তো, আপনার বৃহস্পতি এত জোরালো, কোনো অনিষ্টকেই কাছে ঘেঁসতে দেয় নি।) (জ্যোতিষ অভ্রান্ত) ৪) রত্ন ধারণ করে নি, ফল পায় নি। (জ্যোতিষ অভ্রান্ত)

শুক্র— বাব্বা! আপনাদের ব্যবসায় এত কায়দা?

জ্যোতিষী— তখন বলেছিলাম, পৃথিবীর মানুষকে এগুলো জানাবেন না। এখন বলছি, জানান। ওরা জানলেও ক্ষতি নেই। যারা জ্যোতিষে বিশ্বাস করে, তারা করবেই। নিজেদের বিশ্বাসকে কেউ ডাস্টবিনে ফেলে দিতে চায় না। এটাও হিউম্যান সাইকোলজি। সুতরাং, আপনারা চাইলেও জ্যোতিষ থাকবে, না চাইলেও থাকবে। যুক্তিবাদীরা চিরকাল বিশ্বাসের কাছে হেরে যাবে। ভারতের বেশিরভাগ মানুষ যুক্তি-বুদ্ধি-জ্ঞানকে বাড়িতে আলমারিতে তালা বন্ধ করে রাখে। শুধুমাত্র বিশ্বাস আর ভক্তি নিয়ে ধর্ম, জ্যোতিষ কুসংস্কারের কাছে বলির পাঁঠা হয়। সুতরাং জ্যোতিষ ছিল, আছে, থাকবে। ধর্ম, কুসংস্কার ছিল, আছে, থাকবে। শুধু একটা কথা, মানুষ যেন প্রকৃত শিক্ষা না পায়। যেমন ডিগ্রি পাচ্ছে পাক, কিন্তু যুক্তি-বুদ্ধিকে কাজে লাগানোর শিক্ষা কভি নহিঁ, কভি নহিঁ।

এই অবধি বলে গটগট করে হেঁটে প্রহরীর হাত ধরল, বলল, 'চলো, পৃথিবীতে ফেরত দিয়ে আসবে। গ্রহদের সভা বানচাল হয়ে গেছে। জয় জ্যোতিষশাস্ত্রের জয়।

সনাতনের তৃতীয় আখ্যান সমাপ্ত

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: এই পরিচ্ছেদের অধিকাংশ তথ্য আমি ডাঃ পার্থসারথি গুপ্তর 'বিজ্ঞানের আলোয় জ্যোতিষ' বই থেকে পেয়েছি।

উমা

সংখ্যা এক ব্যাখ্যা অনেক

ভূপতি চক্রবর্তী

একটা খুব পুরনো এবং সকলেরই জানা কাহিনী দিয়ে শুরু করা যাক। এটা যে সময়ের কথা সেই সময় স্কুলে বছরে দুটো বড় পরীক্ষা হত, হাফ ইয়ার্লি আর অ্যানুয়াল, যা কিনা ছাত্রদের পরিভাষায় ছন্দ মিলিয়ে পরিচিত ছিল হাফ ইয়ার্লি আর অ্যানুয়ালি নামে। একটি ছাত্রের গপ্প এটি। সে অঙ্কে বিশেষ সুবিধা করতে পারে নি। ওই হাফ ইয়ার্লিতে পেয়েছিল ৫০, এবার তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৫। তবে যাদের ধারণা, অঙ্কে ভাল নয় মানেই ছাত্র বুদ্ধিতে দড় নয়, তা কিন্তু ঠিক না। এই ছাত্রটি বাড়ি গিয়ে আগেভাগেই বাবাকে জানিয়ে দিল যে এবার অঙ্কে সে যেরকম উন্নতি করেছে তা ক্লাসের সেরা ছেলেও পারে নি। সে এবার হাফ ইয়ার্লির তুলনায় ১০% নম্বর বাড়িয়েছে। পেয়েছিল ৫০ আর অ্যানুয়ালে সেই নম্বরের ১০ শতাংশ অর্থাৎ ৫ নম্বর বেড়ে এবার নম্বর হয়েছে ৫৫। আর ক্লাসের সেরা ছেলে? সে বেচারা (ক্লাসের সেরা ছেলেরা একটু যেন বেচারাই হত) তেমন উন্নতি করতে পারে নি। তার নম্বর আগের তুলনায় বেড়েছে ৬ শতাংশের একটু বেশি। আগেরবার অর্থাৎ হাফ ইয়ার্লিতে সে পেয়েছিল ৯০, এবার তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৬। অতএব বৃদ্ধি হল গিয়ে প্রায় ৬.৭%।

এবার বাবা বললেন, 'ভালো কথা। তোমার আগের তুলনায় উন্নতি হয়েছে দেখা যাচ্ছে। তোমাদের ক্লাসের সেরা ছেলেটি কিন্তু ৬ নম্বর বাড়াতে পেরেছে আর তোমার বেড়েছে ৫। তুমিও চেষ্টা করলে আরও একটু বাড়বে।' ছেলেও ভাল মানুষের মতো জবাব দিল, 'তুমি ঠিকই বলেছ। তবে আগামী বছর কিন্তু আমাদের ফার্স্ট বয় তার নম্বর থেকে ৫ পারসেন্টও বাড়াতে পারবে না।' আমরা এই ধরনের পরিস্থিতিকে অনেক সময় বলি মালভূমি বা

প্ল্যাটো (pleatue) অঞ্চলে পৌঁছে যাওয়া অর্থাৎ ফলটা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, তার থেকে আর বিশেষ উন্নতির সুযোগ নেই। তাই এবার যদি বা কিছু বৃদ্ধি হয় তা হবে খুবই সীমিত। এই পরিস্থিতি যথেষ্ট চেনা।

কিন্তু হলে কী হবে? এরকম বিবৃতি অবলীলাক্রমে রাজনৈতিক নেতারা দিয়ে দেন। মন্ত্রীর মুখে তাই একসময় শোনা গেছে যে, কৃষিক্ষেত্রে পাঞ্জাবের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের বৃদ্ধির হার পর পর দুটি বছরে বেশি হয়েছে। একেবারে সত্যি কথা, তবে বিষয়টা অনেকটা আমাদের ওই ছাত্রটির মতো। পাঞ্জাব তখন কৃষিতে অগ্রণী রাজ্য। কৃষিক্ষেত্রেও এই রাজ্যের উৎপাদন যথেষ্ট উঁচু মাত্রায় পৌঁছে যাওয়ায় তার বৃদ্ধির হার তখন কমই হওয়ার কথা। অথচ পাঞ্জাবের থেকে কৃষিক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার বেশি হয়েছে শুনলে গোড়াতেই একটা খুব ভাল ধারণা হয়। তবে রাজনীতির মানুষেরা একদিকে যেমন তথ্য পরিসংখ্যান ব্যবহার করেন আবার তেমনই তা নিয়ে কখনও বা পড়ে যান সমস্যায়। এবার তেমনই এক বিদেশি কাহিনী শোনাব দেশীয় নামের মোড়কে।

একটি শহরের দুটি হাসপাতাল। দুটিই বেশ বড়সড়। বহির্বিভাগে বহু রোগী হাসপাতাল দুটিতে আসেন এবং দুটিতেই প্রায় প্রত্যেক দিনই কয়েকটি অপারেশন হয়। সরকার স্থির করেছে, এই দুটির মধ্যে একটি হাসপাতাল বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং অন্যটিকে আরো বড় করে গড়ে তোলা হবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কোন হাসপাতাল বন্ধ হবে আর কোনটিই বা টিকে যাবে। ধরা যাক, হাসপাতাল দুটি রামপুর আর শ্যামপুরে। রামপুরের হাসপাতালে গত এক বছরে ২১০০ রোগীর অস্ত্রোপচার করা হয়েছে এবং তার মধ্যে ৬৩ জন রোগী মারা গেছেন। অর্থাৎ শতকরা তিনজন রোগী ওই হাসপাতালে অস্ত্রোপচার করাতে এসে সুস্থ হয়ে ফিরে যেতে পারেন নি। অস্ত্রোপচার করার পরে কিংবা অস্ত্রোপচার করতে গিয়ে রোগীর মৃত্যু হলে তা হাসপাতালের বিরুদ্ধে যায়, হাসপাতালের তাতে দুর্নাম হয় এটা আমাদের মনে রাখতে হবে। শ্যামপুরের হাসপাতালের কর্মদক্ষতা সে তুলনায় ভাল, কারণ গত এক বছরে সেখানে অস্ত্রোপচার করাতে এসে মৃত্যু হয়েছে মাত্র ১৬ জনের। তবে সেখানে সারা বছরে মোট অস্ত্রোপচারের সংখ্যা মাত্র ৮০০। তবু শ্যামপুরের হাসপাতালে অস্ত্রোপচার করাতে এসে প্রাণ হারিয়েছেন দু শতাংশ রোগী। মানতেই হবে যে শ্যামপুরের হাসপাতালের দক্ষতা বেশি। ফলে সরকারকে তুলে দিতে হবে ওই রামপুরের হাসপাতাল, আর শ্যামপুরের হাসপাতালকে আরও বড় করে গড়ে তোলা হবে।

সংবাদ পৌঁছতেই শ্যামপুর হাসপাতাল খুব খুশি, আর রামপুর হাসপাতালও খুব মুষড়ে না পড়ে চেষ্টা চালালো তাদের হাসপাতাল টিকিয়ে রাখার জন্য যুক্তি সংগ্রহের কাজে। রামপুর হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ ভাবলেন যে আজকাল সমস্ত পরিসংখ্যান লিঙ্গভিত্তিক দেখানোর রেওয়াজ হয়েছে, সেই রাস্তায় হাঁটলে তাদের হাসপাতালের কিছু সুবিধা হবে কি? অনেকেই অবশ্য বিষয়টা পাত্তা দিতে চাইলেন না, কারণ মোটের ওপর হাসপাতাল পিছিয়ে রয়েছে, সে কি করে এগিয়ে যাবে একই পরিসংখ্যানের ওপর ভিত্তি করে?

এই ধরনের পরিস্থিতিকে অনেক সময় বলি মালভূমি বা প্ল্যাটো (pleatue) অঞ্চলে পৌঁছে যাওয়া অর্থাৎ ফলটা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, তার থেকে আর বিশেষ উন্নতির সুযোগ নেই। তাই এবার যদি বা কিছু বৃদ্ধি হয় তা হবে খুবই সীমিত। এই পরিস্থিতি যথেষ্ট চেনা।

তবু উৎসাহী একদল লেগে পড়লেন। দেখলেন যে অস্ত্রোপচার করাতে আসা রোগীদের মৃত্যুর হার তাদের হাসপাতালের এক শতাংশ বেশি হলেও পুরুষ ও মহিলা রোগীদের ক্ষেত্রে আলাদাভাবে কেমন কাজ করেছে তাদের হাসপাতাল? এবার কিন্তু এক যাকে বলে ইন্টারেস্টিং বিষয়ের হদিশ পাওয়া গেল। ব্যাপারটা একটু বিশদে বলা দরকার।

রামপুরের হাসপাতালে ২১০০ জন রোগীর অপারেশন করা হয়েছে (যার মধ্যে ৬৩ জনের মৃত্যু ঘটেছে) সেই রোগীদের মধ্যে ৬০০ জন ছিলেন মহিলা। আর অপারেশনের সময় বা তারপর এই রোগীদের মধ্যে ৬ জন মারা গেছেন অর্থাৎ ১ শতাংশ মহিলা রোগী অপারেশনের পরে মারা গিয়েছেন। খেয়াল রাখতে হবে এই হিসেবটা। যেহেতু অপারশনের টেবিলে নেওয়া হয়েছে এমন রোগীর মোট সংখ্যা এই হাসপাতালে ২১০০ তাহলে এখানে পুরুষ রোগীর সংখ্যা ১৫০০ (২১০০-৬০০)।

রামপুরের হাসপাতালে তাহলে অপারেশনের পর মারা গেছেন এমন পুরুষ রোগীর সংখ্যা কত ছিল? আমরা জানি সেই সংখ্যাটি হচ্ছে ৫৭ (৬৩-৬)। অতএব এখানে ৩.৮% (১৫০০ জনে ৫৭ জন) পুরুষ রোগীর মৃত্যু হয়েছে।

এবার যদি একই হিসাব শ্যামপুরের হাসপাতালের জন্য করা যায় তাহলে কী পাওয়া যায় দেখা যাক। শ্যামপুরের হাসপাতাল তুলনায় ছোট। সেখানে অপারেশন হয়েছে মোট ৮০০ রোগীর। এই রোগীদের ৬০০ জন ছিলেন মহিলা। আর তাঁদের মধ্যে মারা গিয়েছেন ৮ জন। শতকরা হিসেবে ৬০০-র মধ্যে ৮ জন মানে ১.৩৩ শতাংশ। অর্থাৎ এই অংশটিতে টেক্কা মেরে দিল কিন্তু রামপুরের বড় হাসপাতাল। শ্যামপুরের হাসপাতালে অপারেশন হওয়া পুরুষ রোগীদের কী অবস্থা? তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন ২০০ (৮০০-৬০০) এবং অপারেশন পরবর্তী সময়ে তাঁদের ৮ জন বা ৪% (২০০-র মধ্যে ৮) মারা গিয়েছেন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে পুরুষ ও মহিলা রোগীদের অপারেশান পরবর্তী মৃত্যুর বিষয়টিতে নজর দিলে রামপুর হাসপাতাল অবশ্যই ভালো ফলাফল দেখিয়েছে। মহিলাদের ক্ষেত্রে অপারেশনের পরে সেখানে মৃত্যুর হার কম (মাত্র ১%, তুলনায় অন্য হাসপাতালের ১.৩৩%) এবং পুরুষদের ক্ষেত্রেও রামপুর হাসপাতালের দক্ষতা বেশি কারণ সে ক্ষেত্রে এই মৃত্যুর হার ৩.৮% যা শ্যামপুর হাসপাতালের ৪ শতাংশের তুলনায় অবশ্যই কম। সামগ্রিক বিশ্লেষণটি বানিয়ে পেশ করা হল মন্ত্রীমশাইয়ের কাছে। তিনি সবটুকু দেখে খুবই বিবেচকের মতো বললেন, 'সত্যিই তো এখান থেকে তো দেখা যাচ্ছে শ্যামপুরের কাজই ভালো হয়েছে। মহিলা এবং পুরুষ রোগী দু ক্ষেত্রেই তারা এগিয়ে। আবার সামগ্রিক পরিসংখ্যান যা দেওয়া হয়েছিল তাতে তো রামপুর ছিল এগিয়ে। ঠিক আছে, আপাতত দুটি হাসপাতালই চালু থাকুক। আমি বরং একটা এক্সপার্ট কমিটি তৈরি করে দিচ্ছি, তারা বিষয়টা খতিয়ে দেখে রিপোর্ট দিক তারপরই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

মন্ত্রীমহোদয় খুব খারাপ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এমন কথা বলা যাবে না। এটি একটি বিশেষ পরিস্থিতি যেখানে সামগ্রিকভাবে কোনো তথ্যকে দেখলে যা পাওয়া যায় বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে তা ভিন্ন হতে পারে, এমনকি তা উলটেও যেতে পারে, যেমনটা এক্ষেত্রে হয়েছে। সংখ্যাতত্ত্বে একে বলা হয় 'সিম্পসন প্যারাডক্স' বা সিম্পসনের কূট (Simpson Paradox)। বিষয়টি প্রথম ধরা পড়ে ঊনবিংশ শতাব্দীতে। যদিও তা নিয়ে খুব খতিয়ে সে সময় দেখা হয় নি। বস্তুত, এই কূট বা প্যারাডক্সের বিষয়টি নিয়ে দর্শনের কিছু গবেষক চিন্তা করেছেন। তবে ১৯৫১ সালে ই এইচ সিম্পসন তাঁর একটি বিখ্যাত গবেষণাপত্রে এই বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন এবং বিষয়টির প্রতি সংখ্যাতত্ত্ববিদ্‌দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। দেখা যায়, এই ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে যখন সংগৃহীত তত্ত্ব বা ডেটা (data) দুভাবে বিশ্লেষণ করা হবে, একবার সার্বিকভাবে আর একবার ডেটাকে ভাগ করে।

সংখ্যাতত্ত্বে একে বলা হয় 'সিম্পসন প্যারাডক্স' বা সিম্পসনের কূট (Simpson Paradox)। বিষয়টি প্রথম ধরা পড়ে ঊনবিংশ শতাব্দীতে। যদিও তা নিয়ে খুব খতিয়ে সে সময় দেখা হয় নি। বস্তুত, এই কূট বা প্যারাডক্সের বিষয়টি নিয়ে দর্শনের কিছু গবেষক চিন্তা করেছেন। তবে ১৯৫১ সালে ই এইচ সিম্পসন তাঁর একটি বিখ্যাত গবেষণাপত্রে এই বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন এবং বিষয়টির প্রতি সংখ্যাতত্ত্ববিদ্‌দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

বিষয়টি ১৯৭৫ সাল নাগাদ একটি ঘটনার মধ্যে দিয়ে সংবাদমাধ্যমের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং বেশ কিছুটা আলোড়নের সৃষ্টি করে। সেই ঘটনাটি সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ দুটি বিভাগে কিছু শিক্ষক নিয়োগের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। উভয় বিভাগেই প্রার্থীদের আবেদনপত্র প্রাথমিক ঝাড়াই বাছাই করার পর উভয় বিভাগেই কিছু পুরুষ ও কিছু মহিলা প্রার্থীকে ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাকা হল। যথারীতি দুই বিভাগে ইন্টারভিউ হল এবং নির্বাচিতরা নিয়োগপত্র পেয়ে কাজে যোগ দিলেন। আর তখনই অভিযোগ উঠল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। কী সেই অভিযোগ? তারা নাকি মহিলা প্রার্থীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করেছেন, অর্থাৎ যথেষ্ট

সংখ্যক মহিলা প্রার্থী থাকা সত্ত্বেও পুরুষ প্রার্থীদের বেশি সংখ্যায় নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে। হিসেবটা এ রকম :

বিভাগ- ইতিহাস, ইন্টারভিউ-এ মোট প্রার্থী ১৩ জন (৫ জন পুরুষ, ৮ জন মহিলা), নিয়োগপত্র পেয়েছেন ১ জন পুরুষ (৫-এ ১ বা ১/৫ বা ২০ শতাংশ সফল) এবং ২ জন মহিলা (৮-এ ২ বা ২৫%)।

অন্যদিকে ভূগোল বিভাগে মোট ১৩ জন প্রার্থীকে ডাকা হয়েছিল ইন্টারভিউ-এ। এখানে পুরুষ প্রার্থী ছিলেন ৮ জন যার মধ্যে ৬ জন নির্বাচিত হলেন (৭৫% সফল) এবং ৫ জন মহিলা প্রার্থীর মধ্যে ৪ জন নির্বাচিত হলেন (৮০% সফল) অর্থাৎ দুটি বিভাগেই মহিলা প্রার্থী সাফল্যের হার বেশি। মহিলারা উভয় বিভাগেই পুরুষদের তুলনায় উচ্চতর শতাংশে নির্বাচিত হয়েছেন।

এই সময় কোনো এক মহল থেকে হঠাৎ করে বলা হল যে বিশ্ববিদ্যালয় আদতে মহিলা প্রার্থীদের প্রতি অবিচার করেছেন এবং পুরুষ প্রার্থীদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছে। তাঁরা দেখালেন যে দুটি বিষয় মিলিয়ে মোট পুরুষ ও মহিলা প্রার্থী উভয়ের সংখ্যাই ছিল ১৩। দেখা যাচ্ছে, ১৩ জন পুরুষের মধ্যে দুটি বিভাগ মিলিয়ে নির্বাচিত হয়েছেন মোট ৭ জন (২+৫) আর মহিলা প্রার্থীদের মোট ৬ জন (২+৪)। অর্থাৎ মহিলা সফল প্রার্থীরা শতাংশের বিচারে উভয় বিভাগেই এগিয়ে থাকলেও মোটের ওপর তাঁরা কম সংখ্যক চাকরি পেয়েছেন, যদিও পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের সংখ্যা ছিল একেবারে সমান সমান। এমন ঘটনাকেই বলা হয়েছে সিম্পসনের কূট। এবং এ ধরনের ঘটনা ঘটে যেতে পারে যখন একই ডোটাকে আলাদাভাবে ও সম্মিলিতভাবে দেখা হয়। এরকম উদাহরণ অনেক সময় পাওয়া যায়। বিষয়টি বিশ্লেষণ করে সিম্পসন এর একটি গাণিতিক মডেল খাড়া করেন, তবে তা যথেষ্ট জটিল।

নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোট শতকরা ৫০-এর বেশ খানিকটা নীচে থাকলেও যে ৫০%-এর অনেক বেশি আসন দখল করে ক্ষমতায় আসা যায় তা কেবল জানি না, এতে আমরা এখন যথেষ্ট অভ্যস্ত হয়ে গেছি। এমন ব্যাপার ঘটা যে স্বাভাবিক তাও বুঝতে পারি। তবে এই সব ক্ষেত্রগুলিতে পরাজিতপক্ষ এখনও সর্বদা বলে চলে যে, বেশি মানুষ শাসক দলের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন। অর্থাৎ বিরোধী দলের সম্মিলিত ভোট শাসক দলের থেকে ঢের বেশি। কথাটা সত্যি, কিন্তু তা এত বেশি নির্বাচনের ক্ষেত্রে লক্ষ করা গেছে যে এখন তা আদতে বক্তাকে কেবল কিছু সান্ত্বনা জোগায়। বহুদলীয় গণতন্ত্রে এরকম তথ্য যে আর বিশেষ কোনো কাজে আসে না, তা বোধহয় এখন সকলেই বোঝেন।

সাহায্য সূত্র:

1. Prof Stewart's Hoard of Mathematical Treasurer (p 212) - Ian Stewart.

2.Simpson's paradox:Stanford Encyclopaedia of Philosophy (plato.stanford.edu/entries/**paradox-simpson**/

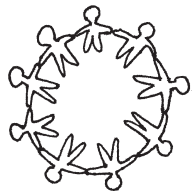

সংগঠন সংবাদ

মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার স্মরণ

সদ্যপ্রয়াত বিজ্ঞান আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদারের প্রয়াণ উপলক্ষে এক শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল গত ৪ জুলাই, রাজাবাজার সায়েন্স কলেজের মেঘনাদ সাহা প্রেক্ষাগৃহে। 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' পত্রিকার আহ্বানে উৎস মানুষ-সহ বিভিন্ন গণবিজ্ঞান সংগঠনের প্রতিনিধিরা যোগ দেন স্মরণসভায়। অনেকেই বলেন তাঁদের প্রিয় মণিদার কথা। কেমন করে আপসহীন মানুষটি বিজ্ঞানমনস্কতার প্রচারে আজীবন লড়াই চালিয়ে গিয়েছিলেন। এমনকি ভূপালের বিষকাণ্ড, অর্চনা গুহ মামলা বা বালি খাদান-দুর্নীতির মতো সামাজিক বিষয় নিয়েও আন্দোলন করেছেন। মণীন্দ্রনারায়ণের পুত্র গৌরব মজুমদারও এসেছিলেন। ব্যক্তি ও বিজ্ঞানমনস্ক বাবার কথা শোনালেন তিনি। কন্যা গৌরী চট্টোপাধ্যায় না আসতে পারলেও বাবাকে নিয়ে একটি লেখা পাঠান। সেটি পাঠ করে শোনানো হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন অধ্যাপক রবীন মজুমদার। তাঁকে সহায়তা করেন মোহিত রণদীপ প্রমুখ।

শ্রমিক সমবায় গড়ে কারখানা চালু
ইউরোপের শ্রমিক আন্দোলনে নতুন বার্তা

অরুণ পাল

আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনে এক নতুন মাত্রা সংযোজিত করেছে ইউরোপের সাম্প্রতিক কালের শ্রমিক আন্দোলন। ইস্তাম্বুল থেকে বার্সিলোনা পর্যন্ত দক্ষিণ ইউরোপের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে গড়ে ওঠা এই আন্দোলন বিশ্ব শ্রমিক আন্দোলনকে এক নতুন তাৎপর্যে মণ্ডিত করেছে। শ্রমিক আন্দোলনের সামনে সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ যখন শিল্প মালিকেরা পুঁজিবাদী অর্থনীতির সঙ্কটকে শ্রমিকের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার জন্য কারখানা বন্ধ করে দেয়। ইউরোপের শ্রমিকেরা এই চ্যালেঞ্জটার মোকাবিলা করার জন্য এক বিকল্প পথ গ্রহণ করেছে। ইউরোপের শ্রমিকেরা যদি সাফল্যের সঙ্গে এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, তাহলে সেটা শ্রমিক আন্দোলনে যেমন একটা নতুন দিশা দেখাবে, সঙ্গে সঙ্গে মালিকদের কাছে একটা হুমকি স্বরূপ কাজ করবে।

শুরুটা ২০০৮ সালে। ইউরোপের প্রায় শ'পাঁচেক শিল্পাঞ্চলে একের পর এক কারখানা বন্ধ হয়ে গেল। সবচেয়ে বেশি স্পেনে, তার সঙ্গে ফ্রান্স, ইটালি, গ্রিস ও তুরস্কের মতো দেশগুলিও পিছিয়ে রইল না। কিন্তু এবারে যেটা ঘটল, শ্রমিকেরা মালিকদের স্বাক্ষরিত এই মৃত্যুপরোয়ানা ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। কারখানা দখল করে উৎপাদন চালিয়ে যেতে লাগলেন। গত কয়েক বছর ধরে আর্জেন্টিনায় এই আন্দোলন সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে গেছে। ফ্রান্সে, ছোট ছোট ৩০টা কোম্পানি, ফোন সারানো থেকে আইসক্রিম তৈরির কারখানা, ২০১০ সাল থেকে সমবায়ের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়ে আসছে। কোসেটা, একটি সমবায় সংস্থার হিসাব অনুসারে কেবলমাত্র ২০১৩ সালেই স্পেনের ৭৫টি কোম্পানির শ্রমিকেরা কোম্পানির দখল নিয়েছে। গত বছর মার্সেইলে এক ডজনেরও বেশি দেশ থেকে শ্রমিক-নিয়ন্ত্রিত কারখানাগুলির প্রায় ২০০ প্রতিনিধি জমায়েত হয়েছিলেন যেখানে উপস্থিত ছিলেন এই সমবায় আন্দোলনের পথিকৃৎ আর্জেন্টিনার প্রতিনিধিরা। আর্জেন্টিনায় বর্তমানে তিনশোর বেশি কারখানার প্রায় ১৫,০০০ শ্রমিক এই আন্দোলনের অঙ্গীভূত। তাঁরা চালু করেছেন নিজেদের ওয়েবসাইট workerscontrol.net এবং autogestion.coop। ব্যক্তিমালিকানাধীন কোম্পানিগুলিকে সমবায় সংস্থার অধীনে আনার ব্যাপারে প্রতিটি ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয়েছে নতুন বাধা, নতুন নতুন সমস্যা। কারখানার মালিকদের আইনি বাধা ছাড়াও রয়েছে প্রশাসনিক লাল ফিতের বাধা, আমলাতান্ত্রিক জড়তা, তারপর পুরনো যন্ত্রপাতি, বাজারে পুরনো পণ্যের চাহিদা না থাকা ইত্যাদি নানা সমস্যা। এইসব নানা সমস্যার ব্যাপারে এতদিনের জঙ্গি ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের এই প্রথম মাথা ঘামাতে হচ্ছে।

আমরা এখানে তিনটি দেশের বন্ধ কারখানার শ্রমিকেরা কীভাবে সমবায় ভিত্তিতে কারখানার মালিকানার বদল ঘটিয়ে কারখানা চালু করলেন, সেটা দেখব।

ফ্রান্সের একটি চা-বাগানের লড়াই

মার্সেইলের পুরনো বন্দর থেকে ২০ মিনিট গাড়ি দূরত্বে সুন্দর ছিমছাম ফ্রান্সের বৃহত্তম চা-বাগান, ফ্রালিব (Fralib)। প্রতি বছর ২৫০ জন শ্রমিক ৬ টন চা-পাতা সংগ্রহ করতেন। ২০১০ সালের সেপ্টেম্বরে অ্যাংলো-ডাচ

মালিক ইউনিলিভার চা-বাগানটা বন্ধ করে দেয়। দীর্ঘ ৫ বছর লড়াই চালাবার পর সামনের মাস থেকে চা বাগানটি আবার খুলতে চলেছে। তবে এবার আর পুরনো মালিকের মালিকানায় নয়, শ্রমিকদের নিজেদের তৈরি সমবায় সংস্থা 'The Societe Cooperative et Participative Thes et infusions'(SCOP-TI)-এর অধীনে। এই সংস্থাটি শ্রমিকদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত ১১ জন প্রতিনিধি (যারা প্রত্যেকেই প্রতিস্থাপনযোগ্য) দ্বারা গঠিত ম্যানেজিং বোর্ড দ্বারা পরিচালিত। স্বাভাবিকভাবেই সংগঠনের কাঠামো আনুভূমিক এবং ঘন ঘন সাধারণ সভা ডেকে সমস্ত কিছুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সংস্থার নির্বাচিত সভাপতি ৫৭ বছর বয়সী জেরার্ড ক্যাজোর্লা-র (Gerard Cazorla) বক্তব্য অনুযায়ী শ্রমিকদের এখন মার্কেটিং থেকে ডিস্ট্রিবিউশন সব কিছুই শিখে নিতে হচ্ছে। ১৩৩৬ দিনের লড়াইয়ের পর শ্রমিকেরা এই সাফল্য পেতে চলেছে। একজন মেশিন অপারেটর জেভিয়ার ইম্বারনৌ (Xavir Imbernou), যাকে নতুন করে প্রশিক্ষণ নিতে হয়েছে, তাঁর ভাষায়, 'মাসের পর মাস বিনা বেতনে, জমানো টাকায় সংসার চালাতে হয়েছে। পুরো পরিবার কষ্ট সহ্য করেছে। তবে সারা দেশ জুড়ে আমাদের সমর্থন ছিল। আমাদের লড়াইটা হয়ে উঠেছিল একটা প্রতীক।' বিতর্ক উঠেছে, প্রত্যেকে সমান মজুরি পাবে, না পেশাগতদক্ষতা অনুসারে পাবে? এই বিতর্কের মীমাংসা করতে শ্রমিকদের খুব বেগ পেতে হয়েছে। জেরার্ড ক্যাজোর্লা স্বীকার করেছেন, তাঁদের এখন কিছু কিছু অস্বস্তিকর বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে সেগুলির সমাধান বের করে নিতে হচ্ছে।

গ্রিসের অভিজ্ঞতা

গ্রিসের দ্বিতীয় বড় শহর থেশালোনিকির (Thessaloniki) শিল্পাঞ্চলে অবস্থিত অত্যন্ত লাভজনক 'ভিয়োম' নামে একটি উৎপাদক সংস্থায় কাজ করতেন মারিয়াস কসটোপৌলস (Marius Kostopoulos) ও তাঁর ৪৫ জন সহকর্মী। এখানে উৎপাদন হত বাড়ি তৈরির একটি প্রয়োজনীয় উপাদান সেরামিক টালি জোড়া লাগাবার আঠা। গ্রিসের নির্মাণশিল্পে মন্দা দেখা দেওয়ায় তার প্রভাব পড়ল ভিয়োমের ওপর। ২০১১ সালের মে মাসে মারিয়াস কসটোপৌলস ও তাঁর সহকর্মীদের চেক পাঠানো বন্ধ করে দিল কোম্পানি। যদিও আগের থেকেই তাঁদের কাজের সময় কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ওই বছরের সেপ্টেম্বর মাসে কোম্পানি উৎপাদন একদম বন্ধ করে দিল। তখন কসটোপৌলস ও তাঁর ২০ জন সহকর্মী দখল করে নিলেন মেশিনঘর আর গুদামঘর। প্রথম সভাতেই তাঁরা ঠিক করলেন সমবায়ের মাধ্যমে কারখানা চালাবেন। এক প্রতিনিধি দল এথেন্স গিয়ে কর্ম বিনিয়োগ মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করল। ২০১২-র মাঝামাঝি ভিয়োমের শ্রমিকেরা পরিবেশ সহায়ক সাবান, ডিটারজেন্ট, সফ্‌ট্‌নার তৈরির সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার জন্য দেশে বিদেশে যোগাযোগ গড়ে তুললেন। তাঁরা ঠিক করলেন, উৎপাদিত পণ্যের দাম কম রাখতে হবে এবং মেশিনপত্র আছে তাই দিয়ে বাজারে সহজলভ্য কাঁচামালের সাহায্যে উৎপাদন চালিয়ে যেতে হবে। স্থানীয় নাগরিক সংগঠন ও ইউনিয়নগুলি উৎপাদিত পণ্যের একটা অংশ বিক্রির প্রতিশ্রুতি দিল। ইতিমধ্যে গ্রিসের মন্দা অর্থনীতির মোকাবিলায় ডজন ডজন ছোট ছোট সমবায়ভিত্তিক দোকান ও বাজার গড়ে উঠেছিল। সেখান থেকেও সাহায্যের আশ্বাস পাওয়া গেল। ২০১৩-র ফেব্রুয়ারি ৬ হাজারেরও বেশি লোকের উপস্থিতিতে তিনদিনের সম্মেলন শেষে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে শুরু হল আবার উৎপাদন। গত বছর এপ্রিলে কোর্ট তাঁদের আইনি স্বীকৃতি দিল। ভিয়োমের পণ্য এখন বিক্রি হচ্ছে গ্রিসে, জার্মানিতে, নেদারল্যান্ডে, সুইৎজারল্যান্ডে, অস্ট্রিয়ায়। সমবায় আন্দোলনের প্রতি নৈতিক ও সংহতিজ্ঞাপক মানসিকতা থেকে ক্রেতারা ভিয়োমের পণ্য কিনছেন। তবে এই সমবায় ভিত্তিতে কারখানা চালু করার কাজটা খুব একটা সহজে হয় নি। মালিকের বিরুদ্ধে একের পর এক মামলা করতে হয়েছে। মালিক এখন চাইছে, জমি বিক্রি করে তাদের দেনা মেটাতে। গ্রিসের নয়া র‍্যাডিক্যাল বাম সরকার মালিকদের পরিত্যক্ত কারখানা যাতে শ্রমিকেরা অধিগ্রহণ করতে পারে, তার জন্য ভাবছে। মারিয়াসের কথা দিয়ে গ্রিসের অভিজ্ঞতা শেষ করছি। 'ভিয়োম যদি তার লক্ষ্যমাত্রা দৈনিক এক টন পণ্য তৈরি করতে সফল হয় তাহলে আমরা মানসিক দিক থেকে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে মালিকদের অধীনে যখন ছিলাম তার থেকে ভাল থাকব। আমরা এখন নিজেদের জন্য কাজ করছি। এটাই হল পার্থক্য।'

তুরস্কের অভিজ্ঞতা

২০১৩ সালের শুরুতে কাজোভা (Kazova) টেক্সটাইল মালিক উমিত (Umit) ও মুস্তাফা (Mustafa) কারখানার ৯৫ জন শ্রমিকের প্রত্যেকের কয়েক মাসের বেতন না দিয়ে ব্যবসার অবস্থা খারাপ এই অজুহাতে বসিয়ে দেয়। শ্রমিকদের বলা হয়, পরে তাদের বেতন দিয়ে দেওয়া হবে। সেই মতো পরে তাঁরা বেতন আনতে গেলে কোম্পানির উকিল তাঁদের জানায়, কাজে অনুপস্থিতির কারণে কোনো ক্ষতিপূরণ ছাড়া প্রত্যেককে ছাঁটাই করা হয়েছে। 'আমরা প্রথমে হতভম্ব হয়ে গেলাম। এতদিন ধরে সপ্তাহে সাতদিন দিনে ১০ ঘণ্টা করে কাজ করেছি। বলা হচ্ছিল ব্যবসা বেড়ে উঠছে। সুতরাং ব্যাপারটা আমাদের কাছে অবিশ্বাস্য বলে মনে হল।' কথাগুলি বললেন কারখানায় ৮ বছরের ওপর কাজ করা শ্রমিক আয়নুর আয়দেমির (Aynur Aydemir)। মালিক রাতারাতি মেশিনপত্র খুলে নিয়ে যায় এবং তার সঙ্গে এক লক্ষের ওপর তৈরি করা জাম্পার আর ৪০ টন সুতো। রেখে যায় কেবল পুরনো বুনন মেশিনগুলো, যেগুলি ঠিকমত কাজ করে না। এপ্রিলের শেষে মুষ্টিমেয় ক'জন শ্রমিক কারখানার বাইরে তাঁবু খাটিয়ে বসলেন, যাতে বাকি জিনিসপত্র মালিক সরিয়ে নিতে না পারে। মালিক ও পুলিশের ভীতি-হুমকি উপেক্ষা করে তাদের এই আন্দোলন চলতে থাকল যা পরবর্তীকালে একটি বিরাট রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল। ৪২ বছরের সারকান গোনাস (Serkan Gonus) স্মৃতিচারণ করলেন, 'আমরা প্রথমে একটু ভয় পেয়েছিলাম। আগে কোনোদিন কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনে যুক্ত ছিলাম না। ধীরে ধীরে আমাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস তৈরি হল। আমরা দেখলাম, আন্দোলন চলাকালীন রাস্তা দিয়ে যাওয়া কত মানুষ আমাদের সমর্থন করছে।' ২০১৩ সালের বসন্তে শ্রমিকেরা সিদ্ধান্ত নিলেন, কারখানা দখল করে চালাবেন। কোর্ট রায় দিল, যেহেতু শ্রমিকেরা বেতন পান নি তাই মেশিনগুলো শ্রমিকেরা পাবেন। ১৯৯০ থেকে কাজ করে আসা কারখানার শ্রমিক মুজফফর যিগিত [Muzaffar Yigit] (৪৩) মেশিনগুলিকে সারিয়ে তুললেন। মালিকের রেখে যাওয়া সুতো দিয়ে প্রথম জাম্পার তৈরি করা হল। নাম দেওয়া হল প্রতিবাদী কাজোভা। সেপ্টেম্বরে তাঁরা প্রথম তৈরি মালের প্রদর্শন করলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে নিজেদের মধ্যে মতভেদ শুরু হল। চারজন শ্রমিক সিদ্ধান্ত নিলেন সমবায় গড়ে তুলবেন। নাম হবে ফ্রি কাজোভা। গোনাসের কথায়, 'আমরা দেখলাম, শুধু শ্রমিকের অধিকার আর প্রতিরোধের তত্ত্ব আওড়ালে চলবে না, দরকার টিকে থাকার মতো একটা মডেল, যাতে আমরা নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারি'। ফ্রি কজোভার শ্রমিকেরা অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জনের জন্য শ্রমিক পরিচালিত কারখানাগুলি ও সারা পৃথিবীর সমবায় সংস্থাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুললেন। মহিলা শ্রমিক আয়নুর আয়দেমির বললেন, 'আমরা মুনাফা চাই না, আমাদের কোনোরকমে চলে গেলেই হল। আমরা এখন দিনে ৬ ঘণ্টা কাজ করি। সকালবেলাতেই কাজে চলে আসি। আমরা এখন নিজেরাই মালিক।' তিনি আরও জানালেন, প্রতিবাদী কাজোভার জাম্পার শুধু তুরস্কেই নয়, ফ্রান্স, ইটালি, পোল্যান্ডেও বিক্রি হচ্ছে। হাসতে হাসতে জানালেন, 'আমাদের মালের এত চাহিদা যে, মালের জোগান দিয়ে সামলে উঠতে পারছি না, এটা প্রমাণ করে আমরা ঠিক রাস্তাতেই চলছি।'

[উৎস : The Guardian]

বাণিজ্যিক নয় মানবিক

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে আপনার সহমর্মী দ্বিমাসিক পত্রিকা।

প্রাপ্তিস্থান: পাতিরাম, বুকমার্ক, পিপলস বুক সোসাইটি, বইচিত্র, অম্লান দত্ত বুক স্টল (বিধাননগর পুরসভা), শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্যকেন্দ্র (চেঙ্গাইল), ডাঃ শুভজিত ভট্টাচার্য (উষুমপুর মিনিবাস স্ট্যান্ডের কাছে, আগরপাড়া)। শেয়ালদা মেন সেকশনের বিভিন্ন বইয়ের স্টল। পাঠক এবং এজেন্টদের যোগাযোগ করার ফোন **নম্বর:** ৯৮৪০৯-২২১৯৪ বা ৯৩৩১০-১২৬৩৭।

উৎস মানুষ
WB/EC 228 ISSN 0971-5800 RN. 37375/80 Rs. 20.00
৩৫ বর্ষ জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৫ ২০ টাকা

উৎস মানুষ পত্রিকার গ্রাহক হবার নিয়ম

বছরে ৪টি বেরোয়, ৩ মাস অন্তর। চাঁদা বছরে ১২০ টাকা। বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ইউ বি আই-এর যে কোনো শাখায় টাকা জমা দিন অথবা অন্য যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা জমা দিন ইউ বি আই কলেজ স্ট্রিট শাখায়। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ নীচে দেওয়া হল—

United Bank of India
College Street Branch, Kolkata- 700073
UTSA MANUSH
SB ACCOUNT NO. 0083010748838
IFSC NO. UTBI0COLI08

ফোন করে কিংবা ই-মেল করে আপনার ঠিকানা (পিনকোড ও ফোন নং সহ) এবং কোন মাস থেকে গ্রাহক হলেন অবশ্যই জানিয়ে দেবেন। বইমেলার স্টলে গ্রাহক করা হয়। গ্রাহক নবীকরণ একইভাবে করা হয়। ডাকে পত্রিকা পাঠানো হবে।

উৎস মানুষ পত্রিকা ও বই পেতে যোগাযোগ করুন

দীপক কুন্ডু
২৯/৩, শ্রী গোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা-১২
(কলেজ স্ট্রিট কর্পোরেশন অফিসের পাশের গলি)
ফোন নং- ৯৮৩০২ ৩৩৯৫৫

পুস্তক তালিকা

বিজ্ঞান জ্যোতিষ সমাজ	৪২.০০
প্রেসিডেন্ট বুশ-এর এই যুদ্ধ অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত	৩০.০০
তিন অবহেলিত জ্যোতিষ্ক রণতোষ চক্রবর্তী	১৮.০০
বাংলা বন্ধ বা শেষের শুরু হিমানীশ গোস্বামী	৪০.০০
এটা কী ওটা কেন (সংকলন)	৫০.০০
যে গল্পের শেষ নেই দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	৫০.০০
আয়ুর্বেদে বিজ্ঞান (সংকলন)	৫০.০০
আরজ আলী মাতুব্বর ভবানীপ্রসাদ সাহু	২০.০০
প্রতিরোধ: অন্ধতা ও অযুক্তির বিরুদ্ধে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত (৩য়)	৬০.০০
বিবেকানন্দ অন্য চোখে/ সমীক্ষা ও আরো কিছু বিতর্ক নিরঞ্জন ধর	১০০.০০
শেকল ভাঙা সংস্কৃতি (সংকলন)	৬০.০০
প্রমিথিউসের পথে (সংকলন)	৩৫.০০
লেখালিখি অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়	২০০.০০
যুক্তিবাদের চার সেনাপতি (সংকলন)	৪০.০০
মূল্যবোধ (সংকলন)	৫০.০০

প্রাপ্তিস্থান: দীপক কুন্ডু ২৯/৩, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা- ১২, বই-চিত্র (কফি হাউসের তিন তলা), পাতিরাম, বুকমার্ক, অমর কোলে (বিবাদী বাগ), দিলীপ মজুমদার (ডেকার্স লেন), সুনীল কর (উল্টোডাঙা), কল্যাণ ঘোষ (রাসবিহারী মোড়), সৈকত প্রকাশন (আগরতলা), র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন (বেনিয়াটোলা লেন, কলেজ স্ট্রীট), মনীষা গ্রন্থালয় (কলেজ স্ট্রীট), ধ্যানবিন্দু (কলেজ স্ট্রীট), বইকল্প ১৮বি, গড়িয়াহাট রোজ (সাউথ), কলকাতা-৩১, জ্ঞানের আলো (যাদবপুর কফি হাউসের উল্টোদিকে), থীমা, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোজ, কলকাতা-২৬, ডঃ গৌতম মিস্ত্রি, ইন্সট্যান্ট ডায়গনস্টিক সার্ভিসেস, মন্ত্রিবাড়ি রোড। পো.অ. - চৌমাথা। আগরতলা-৭৯৯০০১। (০৩৮১)২৩০৮২৪৪/২৩১২৯৩৭। ডাঃ শান্তিরঞ্জন মল্লিকের চেম্বার– কোন্নগর।

উৎস মানুষ সোসাইটির পক্ষে বরুণ ভট্টাচার্য কর্তৃক বি ডি ৪৯৪, সল্টলেক, কলকাতা- ৭০০ ০৬৪ থেকে প্রকাশিত এবং জয়কালী প্রেস, ৮এ, দীনবন্ধু লেন, কলকাতা- ৭০০ ০০৬ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক: সমীরকুমার ঘোষ